KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৪৮ হিমাংশু মুস্তফি, নলবাজার
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রসূন কুমার
Title : পরিচয় (PARICHAYA)	Size : 6"x9"
Vol. & Number : 16/6	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩৫৩
	Condition : Brittle / Good
Editor : হিরণকুমার সান্যাল, গোবিন্দ হালদার	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ,
ষষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৫৩

নগদ মূল্য আট আনা
বার্ষিক মূল্য ৬৷৷০ আনা

এই সংখ্যায় লিখেছেন

নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, আবদুর রশীদ, দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী, অচ্যুত গোস্বামী, বুলবুল চৌধুরী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য সুধাংশু দাশগুপ্ত, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, রবীন্দ্র মজুমদার, বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

পৌষ, ১৩৫৩

—সূচী—

জ্ঞাতব্য

১। 'পরিচয়ে'র **বর্তমান বার্ষিক চাঁদা ৬৷৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক চাঁদা ৩৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা দাম ৷৷০ আট আনা।**

২। 'পরিচয়ে'র **বর্তমান আপিস ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট,** কলিকাতা, চিঠিপত্র চাঁদা প্রভৃতি সবই কার্যাধ্যক্ষের নিকটে সেই ঠিকানায় প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৩। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন :

(ক) তাঁহাদের লেখার কপি তাঁহাদের নিকট রাখা উচিত, ডাকে প্রায়ই গোলমাল হয়। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

(খ) লেখা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই প্রয়োজন; সাধারণত, প্রবন্ধ ও গল্প আনুমানিক ২০০০ শব্দের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি পৃষ্ঠায় এখন আনুমানিক ৪০০টি শব্দ থাকে।

৪। 'পরিচয়' এখন প্রতি বাঙলা মাসের মধ্যভাগে বাহির হইবে। বিজ্ঞাপনদাতারা অন্তত ৭ই'র পূর্বে কপি পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনের মূল্য চিঠিপত্রাদি লিখিলে জানানো হইবে।

সম্পাদক

হিরণকুমার সান্যাল

গোপাল হালদার

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক ৮-ই ডেকার্স লেনস্থ গণশক্তি প্রেসে মুদ্রিত এবং ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

ষোড়শ বর্ষ—১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৫৩

উনিশ শতকে 'ইয়ং বেঙ্গল'

ইংরেজরা যখন এদেশে জেঁকে বসল তখন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন চোখে বিভিন্ন স্বার্থের তাগিদে তাদের দিকে চেয়ে রইল। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় যারা জমিদার, অথবা কোম্পানীর কুঠিয়ালদের কৃপায় যারা দেওয়ান-মুন্সী-মুৎসুদ্দী, তারা ইংরেজ আমলকে অভিনন্দন জানাল অন্তরের সঙ্গে। অভিনন্দন জানাবে না কেন? ইংরেজ আমলের আগে কাঁচা পয়সা রোজগারের এত সুযোগ কে কবে পেয়েছে? ইংরেজ কুঠিয়ালদের খোশামুদী করে যদি মোটা মাইনের চাকুরী মেলে, টাকা দিয়ে বুঝি দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করলে যদি জমিদারের সম্মান মেলে, ঘুষ-নজরানার সহজ রাস্তায় কোম্পানীর সাহেবদের চোখের ওপর যদি টাকা কুড়নোর সুযোগ মেলে তবে—হোক না বিলাতী আমল—কোম্পানীর আমল ভাল বই খারাপ কিসে? বাংলার মুন্সী-মুৎসুদ্দীর দল ইংরেজী আমলের লুঠতরাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। বাংলার হিন্দু পণ্ডিতরা, স্বাজাত্যবোধের নামে বেশভূষা আচার-ব্যবহারে বিদেশীদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেদের গোঁড়ামী আঁকড়ে ধরে রইলেন। কিন্তু বিদেশীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী নিতে অথবা ইংরেজের আদালতে তর্জমা করার দায়িত্ব নিতে তাঁদের স্বাজাত্যবোধে মোটেই বাধল না। হিন্দু পণ্ডিতদের চোগে ইংরেজ আমল ছিল বিধাতার বিধান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রাজীবলোচন রায় তাঁর "কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে" (১৮০৫) পাঁচমুখে প্রচার করলেন ইংরেজ আমলের মহিমা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে তাই ইংরেজের গুণপনা ফুটে বেরুল—"বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক....."। ইংরেজের গুণ কি কি? তাঁরা "সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন সকল গুণ তাঁহাদের আছে অথচ যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক।" ("কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্"—পৃঃ ৩৫, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, ১৩৪৩) শুধু ইংরেজ স্তুতি করেই হিন্দু পণ্ডিতরা থামলেন না। গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বাধল না ইংরেজের

কাছে দরবার করতে তাঁদের ধর্ম রক্ষার জন্য। তাঁরা প্রার্থনা করলেন : "শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমাদিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন" (সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ মে, ১৮৩১)। আদর্শের আকাশ-পাতাল পার্থক্য সত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দু নেতাদের সঙ্গে কোম্পানীর সাহেবদের কোনোদিন ঝগড়া বাধেনি, বরং হিন্দু জমিদার ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা ছিল কোম্পানীর আমলের চিরদিনের অনুগত বন্ধু। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে হিন্দু জমিদার ও শহরঘেঁষা হিন্দু পণ্ডিতরাই সেদিনের বাংলা নয়। বাংলার অগণিত হিন্দু-মুসলমান তাঁতী-চাষী-কুমোর-বেনে ইত্যাদি সেদিনের 'ছোটলোকদের' কাছে ইংরেজ আমল ছিল একটা বিভ্রান্তিকর দুর্ঘটনা। তাঁতীর তাঁতের ব্যবসা ওটিয়ে এল, চাষীর ক্ষেতের ব্যবস্থা নষ্ট হোতে বসল, বিলাসের তাড়নায় ঘরে ঘরে অভাব ঢুকল। চাষীরা দেখল ইংরেজ আমলে তাদের জীবনে ভাঙ্গন ধরেছে। কিন্তু যত বড়লোকদের মুখে তারা শোনে ইংরেজরা ভারী ভাল লোক, খুব সভ্য, ভারতবাসীর মস্ত বন্ধু। নিজেদের প্রত্যক্ষ দুঃখের অভিজ্ঞতা ও বড়লোকদের বিজ্ঞাপন কেমন যেন মিল খায় না। তাই তারা বিভ্রান্ত হোয়ে পড়ে। শান্তিপুরের সুতাকাটুনীরা তাই সরল বিশ্বাসে কোম্পানীর সাহেবদের কাছে জানায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা—হয়তো কোনো প্রতিকার হবে এই আশায় ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা"—শান্তিপুরের সূতা কাটুনীর দরখাস্ত—'সমাচার চন্দ্রিকা' ২০ জুন ১৮২৯)। চাষীদের দুর্দশারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এ-যুগের সাময়িক পত্রের পাতা থেকে। ১৮ মে ১৮২২ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নীলকরদের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। তাতে বলা হোয়েছে যে-সব প্রজা নীলের দাদন নিতে রাজী হয় না তাদের উপর নানারকম জুলুম চলে, আবার নীলের দাদন যে প্রজা নেয় তার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই।

তবে গ্রামের তাঁতী-চাষীরা যে-চোখেই ইংরেজ আমলকে দেখুক, কলকাতা ও শহরতলীর লোকেরা ইংরেজ শাসনকে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। শুধু স্বীকার করেই নেয়নি, নিজেদের জীবনধারাকেই এই নতুন পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে নিতে তারা বেশ প্রস্তুত হোতে আরম্ভ করেছিল। তারা দেখল এই নতুন আমলে উন্নতি করতে গেলে ছ'চারটে ইংরেজী কথা জানার অবশ্য দরকার। তাই মুন্সী-মুৎসুদ্দীগিরির জন্য যেটুকু ইংরেজীনবিশ হওয়া দরকার তার তাগিদে কলকাতা ও শহরতলীতে ফিরিঙ্গিদের ছোট-খাট স্কুল গজিয়ে উঠল। কিন্তু এই শিক্ষার পিছনে না ছিল কোনো আদর্শ, না ছিল কোনো প্ল্যান। কিন্তু ক্রমশ চাকুরীর মোহে এ-দেশী ভদ্রলোকদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হোতে লাগল। রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরাও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে উৎসাহী হোলেন। বোধ হয় ইংরেজ আমলের পারিবেশে ভাল চাকুরী পেতে গেলে ইংরেজী না শিখলে চলতো না বলেই তাঁরাও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে সাহায্য করতে লাগলেন। তবে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষাকে নেহাৎ অর্থকরী বিদ্যা বলেই নিয়েছিলেন, ইংরেজী দর্শন বা বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রবণতা বা গণতান্ত্রিকতাকে গ্রহণ করতে তাঁরা ছিলেন ঘোর নারাজী।

ইংরেজী শিক্ষার পিছনে নতুন জাগতিক পরিবেশে নতুন জীবনের যে আদর্শ লুকিয়ে ছিল তাকে চিনতেও কেউ কেউ ভুল করেননি। এই দলের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন।

তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন শুধু চাকুরী পাবার সুবিধার জন্য নয়, ইংরেজ জাতের বিজ্ঞান চর্চা, দর্শন ও উৎপাদনী শক্তিকে আয়ত্ত করে তিনি বাঙালীর মনে নতুন আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই জোর দিয়েছিলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞান, কলা ও দর্শনের উপর। সংস্কৃত শিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে, ঐ শিক্ষায় পুরানো দিনের কুসংস্কারগুলি নতুন করে জীবন পাবে, অযৌক্তিক পুরোহিততন্ত্রের কায়েমী স্বার্থেই শিক্ষার নামে মানুষের মনকে নতুন করে নির্জীব করে তুলবে। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের সম্মিলিত চেষ্টায় আগের দিনের ফিরিঙ্গি স্কুলের জায়গায় হিন্দু কলেজের উন্নততর শিক্ষার প্রচলন হোলো। হিন্দু কলেজের শিক্ষার পিছনে গড়ে উঠল আদর্শ, বিজ্ঞানী মনোভাব যুক্তিবাদের বন্যা—রামমোহন যা চেয়েছিলেন অনেকটা তাই। তবে রাধাকান্ত, রামকমল প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু নেতাদের জিদের জন্য রামমোহনকে হিন্দু কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হোয়েছিল। রামমোহন সরে যেতে বাধ্য হোলেও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রেরণা ক্রমশ বেড়েই চলতে লাগল। বরং রামমোহন নতুন দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার থেকে সরে গিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিওর নেতৃত্বে হোয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ বন্ধনহীন স্বাধীন চিন্তার পূজারী। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ দেখলেন তাঁদের সব সতর্কতা সত্ত্বেও ছাত্রেরা গতানুগতিকভাবে আদর্শহীন চাকুরী জীবনের মোহে কিছুতেই আকৃষ্ট হচ্ছে না, ছাত্রদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হোয়ে উঠল। গোঁড়া হিন্দু নেতারা কোম্পানীর আমলের টোরীপন্থী সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চেষ্টা করলেন এই আন্দোলনের গোড়ায় ঘা দিতে। কিন্তু তাঁদের শত চেষ্টা সফল হোলো না।

হিন্দু কলেজের এই সব ছেলেরা বেশির ভাগ ছিল সাহেব-ঘেঁষা দেওয়ান, সওদাগরি অপিসের বাবু বা ক্ষুদে-সরকারী চাকুরেদের ছেলে। শহর বা শহরতলীর প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কায়স্থ তিলি ইত্যাদি সব জাতের লোক। হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে যোগ্যতা সত্ত্বেও এদের সামনে রুজি-রোজগারের উপায় ছিল হয় ছোট-খাটো ব্যবসা, জমিদারের ম্যানেজারী নয় ছোট-খাটো ইংরেজী স্কুলে মাস্টারী। (Bholanath Chandra—"Life of Digambar Mitra," ৪র্থ অধ্যায়)। লর্ড কর্নওয়ালিশের কড়া শাসনে ভারতবাসীর সরকারী চাকুরী পাবার উপর যে-সব বাধা নিষেধ বসেছিল সেগুলো তাদের মনকে আরও বিষিয়ে তুলল। এ ছাড়া কৌলিন্যের নামে, বাল্য বিবাহের নামে, জাতির নামে, ধর্মের নামে যে-সব বাধা নিষেধ তাঁদের আত্মস্ফুরণের পথে বাধার সৃষ্টি করে সে-সবের বিরুদ্ধেও তাঁদের মন বিদ্রোহী হোয়ে উঠল। শহরে আবহাওয়ায় এঁরা মানুষ হওয়ায় আগে থেকেই এঁদের মনে সংস্কারের শাসন আলগা হোয়ে এসেছিল। ডিরোজিওর শিক্ষা এঁদের মনের রুদ্ধ অসন্তুষ্টিকে পথ দেখিয়ে দিল। ইউরোপীয় স্বাধীন চিন্তার কষ্টিপাথরে এঁরা দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, ইংরেজ আমলের দোষ-গুণ যাচাই করতে লাগলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই স্বাধীন চিন্তার মূলে ছিল ডিরোজিওর শিক্ষার অনুপ্রেরণা। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদিনী শক্তি ডিরোজিওর শিষ্যদের মনে এনেছিল এক দুর্বার স্বাধীনতা স্পৃহা। আর একদিকে হিউমের আস্তিকতার বিরুদ্ধে গভীর যুক্তি ও অন্যদিকে ডক্টর রীড ও

ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের যোগ্য উত্তর-প্রত্যুত্তর তাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল যুক্তিবাদের তুফান। ফলে তাঁর শিষ্যদের কারুর মনে গড়ে উঠেছিল যুক্তিশীল ধর্মপ্রবণতা আবার কেউ হোয়ে উঠলেন নাস্তিকতার বড় পাণ্ডা। তবে সবার মনেই যেটা পেয়ে বসল সেটা হোলো সব কিছু যুক্তি দিয়ে যাচাই করে দেখার প্রবৃত্তি, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আপদে-বিপদে সব সময়েই তীক্ষ্ণ নীতিশীলতা। ডিরোজিও নিজে তাঁর শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তিনি একটা চিঠিতে লিখলেন : "কারুর মনে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া আমার কোনোদিন কাজ ছিল না। তবে আমার কোনো কোনো ছাত্রের নাস্তিকতার জন্য যাঁরা আমাকে দায়ী করেন তাঁদের আমি এই কথা বলতে পারি যে আমার কোনো কোনো ছাত্রের আস্তিকতার জন্যও আবার আমি কৃতিত্ব দাবী করতে পারি" (ডক্টর উইলসনের কাছে লেখা ডিরোজিওর চিঠির অনুবাদ)।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিতে' ডিরোজিওর শিষ্যদের 'নব্য কলকাতা' বলেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের বলেছেন 'নব্য বঙ্গ'। এ-যুগের সাময়িক পত্রে তাঁরা 'নব্য বঙ্গ' বলেই বিশেষ পরিচিত। শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের যুগকে ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে ধরেছেন। নব্যবঙ্গের নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব ইত্যাদি। ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র থেকে দেখা যায় কেবল এই ক'জনকে নিয়েই নব্যবঙ্গ আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের রেশ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল। মিশনারী ও সরকারী কর্মচারীরা আগাগোড়াই এই আন্দোলনের বিপ্লবী ভাবধারার ছিলেন ঘোর বিরোধী। এই আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশ সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সবকিছুর উপরে পড়ে। 'নব্যবঙ্গের' সাহিত্যে ডিরোজিও ও ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ডিরোজিওর সভাপতিত্বে "অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনকে" কেন্দ্র করে এই নতুন চিন্তাধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমশ একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোলো। এর নাম Athenium, "প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করা এর ছিল প্রধান কাজ"। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখলেন : "যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দু ধর্ম", প্যারীচাঁদ মিত্র নব্যবঙ্গের যুক্তিবাদিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন : "ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না, অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত" (Peary Chand Mitra—Biographical Sketch of David Hare দ্রষ্টব্য)।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোর্টে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন : "আমি গঙ্গা মানি না"। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "Enquirer" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার নিয়ে এই পত্রিকায় আলোচনা চলত। কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠা ছিল প্রথম শ্রেণীর। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন এই দলের আর একজন

অগ্রগামী নেতা। তাঁর চেষ্টায় 'লিপিলিথন সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই দলের আর একজন নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা" (১৮৩৮) স্থাপিত হয়। এই দলের মুখপত্র হিসাবে নতুন সংবাদ পত্র হয়ে দাঁড়াল "জ্ঞানান্বেষণ।" রামগোপালের বাবা একবার রামগোপালকে অনুরোধ করেন : "তুই একবার স্বীকার কর তুই হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আচরণ করিস না"। তার উত্তরে রামগোপাল বলেন : "আপনার অনুরোধে আমি সব কিছু করতে পারি কিন্তু মিথ্যা বলতে পারবো না।" আর একবার রামগোপালের আর্থিক অসচ্ছলতা চরমে ওঠে। তাঁর বন্ধুরা তখন সম্পত্তি বেনামী করতে তাঁকে উপদেশ দেন, কিন্তু রামগোপাল এই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন : " আমার সব যায় সেও ভাল তবু আমি যাদের কাছে ঋণী তাদের কিছুতেই প্রতারণা করতে পারবো না।" রসিক ছিলেন এই দলের বড় চিন্তানায়ক। তাঁর পাণ্ডিত্য, মনোবল, মৌলিক চিন্তাধারা—এই আন্দোলনের ছিল প্রাণ। ঘুষ নেওয়া, তোষামোদী করা, জাল-জালিয়াতী করা যখন সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার তখন নব্যবঙ্গের নেতাদের এই নীতিনিষ্ঠা, এই ঘুষ, জাল-জালিয়াতীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, তাঁদের মানুষের অধিকার সম্বন্ধে গভীর বেদনা, সত্যিই সুস্থ সমাজ-নিষ্ঠার পথে জাতির আত্মপ্রস্তুতির নির্ভুল ইঙ্গিত। পরে নব্যবঙ্গের নেতাদের আর একখানি সংবাদ পত্র বেরুল। তার নাম "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" (১৮৪২)। নব্যবঙ্গের চিন্তায়, বক্তৃতায়, যেখায় একসঙ্গে দাবী উঠলো—নারীর অধিকার সম্বন্ধে, ছুঁৎমার্গের অবসান সম্বন্ধে, হিন্দু-যবনের মনগড়া পার্থক্যের বিরুদ্ধে। মানুষের অধিকার মানুষ দাবী করল। নব্যবঙ্গের নেতাদের মুখে তাই দেখি মরিসাস দ্বীপে কুলি চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সরকারী দপ্তরে কুলিদের বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে অসন্তোষ। মানুষের অধিকার সম্বন্ধে এই সচেতনতা তাঁদের অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল, জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহায়-প্রজার দুর্দশার ছবি সহানুভূতির সঙ্গে আঁকতে। প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা "জমিদার ও রায়ত" নামক প্রবন্ধে (Calcutta Review, Vol.IV No 12, 1846) রায়তের প্রতি এই দরদ অত্যন্ত স্পষ্ট। মানুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে দক্ষিণারঞ্জন লিখেছেন : "ভগবান নিরপেক্ষভাবে জন্মগত অধিকারে সকল মানুষকেই সমান করেই তৈরী করেছেন"। শিক্ষা ও সংস্কৃতি যাতে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে তার দিকেও এঁদের ছিল দৃষ্টি। তাই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার "মাসিক পত্রিকা" নামে এক নতুন ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকায় চলতি ভাষা চালু হোলো। লক্ষ্য হোলো, স্ত্রীলোক ও বালকেও যাতে বিষয়বস্তু বুঝতে পারে ও ধরতে পারে। প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" এই নতুন স্টাইলের সার্থক সৃষ্টি।

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের এই-বিপ্লবী চিন্তাধারা উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী, মিশনারী সাহেব ইত্যাদির চোখে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। তারা ভয় করতে লাগল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত শেষে সরকারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় পরিণত না হয়। তাই প্রথম থেকেই এই অন্দোলনকে নিরুৎসাহ করা, একে ঠাট্টা করা, এর উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়ে উঠেছিল এইসব কর্মচারী মিশনারীদের কাজ। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন এই আন্দোলন পছন্দ করতেন না। করার কথাও নয়। তাঁর টোরী মত আর নব্যবঙ্গের উদারপন্থী মনোভাবে তফাৎ ছিল অনেক। এর অনেক আগেই উইলসন সাহেব ডিরোজিওর

নেতৃত্বে 'এ্যাকাডেমিক এসোসিএশনের' সভা বন্ধ করছেন বিপ্লবী চিন্তাধারার অজুহাতে। সাহেবরা বাঙালী নেতাদের স্বাধীন চিন্তার উপর কটাক্ষ করে এই নব্যবঙ্গ দলকে 'তারাচাঁদ চক্রবর্তীর দল' অথবা "চক্রবর্তী ফ্যাকশন" বলে এ-আন্দোলনের গুরুত্ব কমাতে চাইতেন।

কিন্তু নব্যবঙ্গ আন্দোলনের পিছনে যে স্বাধীন চিন্তার অনুপ্রেরণা ছিল তাতে সাহেবদের এত বেশি ঘাবড়াবার কোনো কারণ ছিল না। এই আন্দোলনের নেতাদের রুজি-রোজগার বাঁধা ছিল কোম্পানীর আমলের সঙ্গে। যোগ্যতা সত্ত্বেও বাঙালীরা ভাল সরকারী কাজ পেত না। সরকারের কাছে এদের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের কোন সমাদর ছিল না—এতে অবশ্যই সরকারের বিরুদ্ধে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীদের একটা অভিযোগ গড়ে উঠেছিল। তাঁরা কোম্পানীর উপর চাপ দিয়ে সরকারী চাকুরী পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তবে এর জন্য সরকার তাদের উপর চটে না যায় সেদিকেও তাদের নজর কম ছিল না। সরকারের মৃদু সমালোচনা করে অধিকার দাবী করা ছিল তাদের লক্ষ্য। সে-যুগে একজন লেখক বাঙালীদের এই বিক্ষোভের কথা লিখেছিলেন। তাঁর মতে : "হিন্দু কলেজের উচ্ছাভিলাষী ছাত্রদের মুখের উপর তাদের উন্নতির দরজা বন্ধ করে দেয়া হোত। একদিকে কলেজের শিক্ষায় তাদের মন নতুন উত্তেজনা, নতুন আশা, নতুন আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠতো, অন্যদিকে সরকারী বিধিনিষেধ তাদের বুকের আশাকে বুকের মধ্যেই পিষে মারতো (Bholanath Chandra—Life of Digambar Mitra, P. 184)। শিক্ষিত বাঙালীদের এই হতাশা রূপ পেল রামগোপাল ঘোষের ভাষায় : "আমাদের মত দেশে এবং আমাদের মত সরকারের অধীনে ভারতবাসীর যোগ্যতা ও মৌলিকতা যে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে না এতো জানা কথা। আমাদের দেশ স্বাধীন নয়, তাছাড়া আমাদের সরকারও দেশের জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। অবশ্য বর্তমান সরকারের দোষ দিচ্ছি না, হয়তো বর্তমান পরিবেশে এর চেয়ে ভাল সরকার আশা করাও যায় না। তবে সরকারী চাকুরী পাওয়ায় যেখানে এত বাধা-নিষেধ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে যেখানে চাকরী পাওয়ার এত অসুবিধা সেখানে ব্যক্তিমনে উন্নতি স্পৃহা ব্যাহত হবে বৈকি (হরিশ-স্মৃতি সভায় রামগোপালের বক্তৃতার অনুবাদ)। দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও বললেন : "ভারতের দারিদ্র্যের কারণ তার পরাধীনতা"। আবার একই মুখে বললেন যে তিনি কোম্পানীর শাসনের শত্রু নন। রামগোপালের মত তিনিও ভাবলেন সরকারী চাকুরীর দরজা উন্মুক্ত হলেই ভারতবাসীর উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। রামমোহনের মতই কোম্পানীর সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে সরকারী চাকুরী বা জুরী প্রথা আদায় করা অথবা কালা আইন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বিচারের সমতা দাবী করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। রামমোহনের মতই এঁরাও এই দাবীগুলোর মধ্যে তাঁদের সার্থসিদ্ধির উপায় দেখেছিলেন। রামমোহনের মতই রায়তের দুঃখে দুঃখিত হলেও এঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ছাড়া বিপক্ষে কোনো কথা বলেননি। কোম্পানীর আমলের নতুন অর্থনৈতিক পটভূমিকায় যে-সব বিদেশী ফার্ম গজিয়ে উঠেছিল তাদের অধীনে এ আন্দোলনের অনেকেই চাকুরী করতেন। কেউ কেউ বা নিজেদের স্বল্প মূলধনে এই সব বিলাতী ফার্মের তাঁবেদারী করে বা এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্র যুক্তভাবে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করতেন; রামগোপাল ঘোষের উন্নতির মূলে ছিল কেলসল ঘোষ এণ্ড কোম্পানী বা আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী।

রামগোপাল পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর ও দিগম্বর মিত্র সুন্দরবন রিক্লামেশন এণ্ড ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানীর ডিরেক্টার ছিলেন। কোম্পানীর আমলের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যাঁদের জীবনের উন্নতি-অবনতি ছিল বাঁধা তাঁদের কাছে স্বাধীন চিন্তার আবেগ যতই তীব্র হোক সামনে এগিয়ে চলার বাধাও ছিল যথেষ্ট। তাই এই আন্দোলনের দাবী মাঝপথে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় যে দূরত্ব ছিল তার থেকে স্ববিরোধিতার জন্ম নেওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

বস্তুত সমাজ-বোধ বা রাজনীতি-বোধের দিক থেকে রামমোহন ও নব্যবঙ্গের নেতাদের জীবন-দর্শনে কোনো শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল না। রামমোহন ও নব্যবঙ্গের নেতাদের জীবন-দৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন পরিবেশে সম্মানজনক শর্তে আত্মস্ফুরণের দাবীর প্রস্তুতি। দুইয়ের চোখেই ইংরেজ আমলকে তাড়িয়ে মারবার কোনো তাগিদ নেই। কেবল ইংরাজী আমলের আওতায় স্বার্থরক্ষার জন্য জোর চেষ্টা। এই জন্যই বাহ্যত দুই দলের ঝগড়া থাকলেও জর্জ টমসনের নির্দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে সমবেত হলে সমস্বার্থ দাবী করতে তাঁদের মোটেই বাধেনি। এই সোসাইটির কার্যকলাপে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীন চিন্তার খোঁজ অল্পই পাওয়া যায়। বরং সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদার জমিদারী মনোভাব আর নব্যবঙ্গের নেতাদের সরকারী চাকুরী পাবার জন্য দাবী-দাওয়া স্বার্থের দিক থেকে এই দুই দলের নেতাদের সান্নিধ্যের পরিচয় দেয়। রসিক ও তারাচাঁদের রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা এই যুক্তির পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

তবে বৃহত্তর শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে এঁদের মধ্যে তফাৎ না থাকলেও এঁদের তফাৎ ছিল অন্য একদিক থেকে। রামমোহন ও তাঁর শিষ্যেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নব্যবঙ্গ প্রাচ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রতীচ্যের উপর বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। রামমোহন ও তাঁর শিষ্যদের ছিল জাতিগর্বী মনোভাব, গঠন-ধর্মী মন, জীবনের প্রতি আস্থাশীল দৃষ্টি। নব্যবঙ্গের ছিল অধীর আগ্রহের প্রাচুর্য, শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব। তাই নব্যবঙ্গের এক নেতার চরিত্রের সঙ্গে আর এক নেতার চরিত্রের মিল খায় না। কারুর মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ নীতিবোধ ও স্বাদেশিকতা, আবার কারুর চরিত্রে দেখি সংযমের একান্ত অভাব। এই স্ববিরোধিতা ও অসংযমী মনোভাবের মূলে ছিল বাঁধন-হারা স্বাধীন চিন্তার প্রভাব। শিবনাথ শাস্ত্রীর চোখে রামমোহন ও নব্যবঙ্গের এই তফাৎ ধরা পড়েছিল—"রামমোহন নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তাহা তিনি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য নীতি ও জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক সকলপ্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত-প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ একদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপর দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ, এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। .....ভাঙ্গো, ভাঙ্গো, ভাঙ্গো এই তাঁহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল।" (শিবনাথ শাস্ত্রী—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"—পৃষ্ঠা-১০০)। নব্যবঙ্গ মেকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জাহির করলেন—"এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ

বা আরব দেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন ; সেক্সপীয়র সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলের সমক্ষে বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"

নব্যবঙ্গ রামমোহন ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যপন্থী বলে কটাক্ষ করতে লাগলেন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর দুর্গা পূজা করতেন বলে স্বয়ং ডিরোজিও তাঁকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। রামমোহনের শিষ্যেরা সাহস গোপন করে অত্যন্ত সাবধানে চলেন—এই বলে 'জ্ঞানান্বেষণ' এঁদের আক্রমণ করলেন। রামমোহনেরও নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না। তিনি কলকাতায় এই নতুন দলের অভ্যুত্থানে মোটেই সুখী হননি। তাঁর মতে এই দলে ছিল অপরিণামদর্শী যুবকরা, এঁদের মধ্যে অনেক মেধাবী লোকও ছিলেন। পুরোদস্তুর অবিশ্বাস ছিল এঁদের জীবনের মূলমন্ত্র। "তাঁর চোখে এঁরা ছিলেন গোঁড়া হিন্দুদের চেয়েও নীতিহীন এবং তাঁর মতে এঁদের আদর্শে নীতির কোন বালাই নাই" (Miss Collet-এর 'Rammohun Roy' বই থেকে একটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৩)। তাঁর চোখে নব্যবঙ্গ আন্দোলনের সব চেয়ে বড় গলদ এই ছিল যে এরা নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল, অথচ তার আগে আর একটা ধর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। রামমোহন যখনই কোনো ইংরেজের সংস্পর্শে আসতেন তিনি তাকে উদ্বুদ্ধ করতেন হিন্দু শাস্ত্র পড়ে দেখতে। অথচ নব্যবঙ্গ নিজের দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ভুলতে বসেছিল। এই জন্যই ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল গঠনধর্মী, স্থিতিশীল, জাতি-গর্বী। নব্যবঙ্গ আন্দোলন ছিল ভাঙনমুখী, হুজুগে ও জাতির নাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কহীন।

এইজন্যই কিছুদিনের মধ্যে নব্যবঙ্গ আন্দোলনে ভাঙন ধরে। অতিরিক্ত পাশ্চাত্য-প্রীতিতে অনেকের অবসাদ আসে। আবার অনেকে ধর্মের আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। নব্য-বঙ্গের বিশিষ্ট নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গলের 'ভাঙ্গ ভাঙ্গ রবে' পরে বীতশ্রদ্ধ হোয়ে খ্রীস্ট ধর্মের আশ্রয় নেন। আরও অনেকে ডাফ্ সাহেবের সংস্পর্শে এসে খ্রীস্টান হন। আবার কেউ কেউ বহুনিন্দিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। রামগোপাল ঘোষ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের কপট বলে মনে করতেন। এ ছাড়া আর একদল (প্যারিচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি) শেষ বয়সে প্রেত-তত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী হোয়ে উঠেন।

আগেই বলেছি যে, রামমোহন ও নব্যবঙ্গের ভাবধারায় কোনো শ্রেণীগত পার্থক্য থাকলেও সমাজের নতুন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে এঁদের ছুয়েরই ছিল নাড়ীর টান। নব্যবঙ্গের যাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ছিল তারা হোলো একদিকে ধর্মসভাপন্থী গোঁড়া হিন্দুর দল—পুরনো সমাজের মৃতপ্রায় শক্তিগুলোকে আঁকড়ে ধরে যাঁরা বাঁচতে চেয়েছিলেন। আর তাঁদের বিরোধী ছিল সেদিনের সরকারী কর্মচারী ও মিশনারী সাহেবরা—যারা ভারতবাসীদের নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। এই দুই দলই ছিল নব্যবঙ্গের বড় শত্রু। নিজেদের গোঁড়ামিতে মশগুল হয়ে গোঁড়া হিন্দুরা চাইল এই আন্দোলনকে সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করতে। তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে জোট করে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে তাড়ালেন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে। কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রাণতাকে উপহাস করে

তাঁরা বলতে লাগলেন—'কেষ্টা বাবা।' নতুন চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করার জন্য পিতারা পুত্রদের ভৎর্সনা করলেন, প্রহার করলেন, পাগলাগুঁড়ো খাওয়ালেন, গভর্নর সাহেবের কাছে আপিল করলেন। গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার পুরু চশমা চোখে দিয়ে তাঁরা ইংরেজ আমল থেকে কেবল টাকা রোজগার করতে চাইলেন, তার বেশি শিখতে এঁরা চাইলেন না।

সরকারী কর্মচারী ও মিশনারীরাও নিজেদের হীন স্বার্থের তাগিদে এই আন্দোলনকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু কেরানী তৈরী করতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন চিন্তার খোরাক যোগাতে চাননি। তাই নব্যবঙ্গ যখন অনেক বেশি হারে শিক্ষা প্রসারের দাবী করল তখন এইসব কর্মচারীরা বার বার সরকারকে সতর্ক করে দিল—বেশি লেখাপড়া শেখালে বাবুদের মাথা বিগড়ে যাবে তখন এদের সামলানো হবে শক্ত (সরকারী কর্মচারীদের এই মনোভাবের বিষয় জানতে পারা যায় Life of Digambar Mitra নামক বইয়ের পৃষ্ঠায়—(পৃঃ ৩০২-৩০৯ দ্রষ্টব্য)। তারা দেখল—নব্যবঙ্গের নেতারা ছিলেন মেকলের খুব ভক্ত। অথচ সেই মেকলে যখন তাঁর চৌরঙ্গী-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত বাঙালী জাতের উপর কটাক্ষ করলেন তখন এঁরা মেকলের বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিবাদ তুললেন। নব্যবঙ্গের এই প্রতিবাদস্পৃহা ও স্বাধীন চিন্তার মাপকাঠিতে সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্মকে দেখার স্পর্ধাকে তারা ভয় করেছিল। তাই এই আন্দোলনকে লোকের চোখে হেয় করে তুলতে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। রামগোপাল ঘোষের 'কালা আইন' ভিত্তি করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে একজোট হোলো বিভিন্ন ইউরোপীয় স্বার্থবান সম্প্রদায়। স্বার্থবান ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিশেষত চেম্বার অফ কমার্স, ট্রেড এসোসিয়েশন, ইন্‌ডিগো প্লান্টারস্ এসোসিয়েশন এই আন্দোলনে অগ্রণী হন। ইউরোপীয়দের চক্রান্তের ফলে রামগোপাল 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির' সহকারী সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হোলেন। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর বাঙালীরা যে ডেপুটী কালেক্টরের পদ পেতে লাগলেন তাতেও সেদিনের সাহেব কর্মচারীরা সুখী হতে পারেননি। এঁদের তুলনায় শিক্ষিত বাঙালীদের যোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। তবুও বাঙালীদের পদোন্নতি তো হোতোই না বরং অনেককেই চাকুরীজীবনে কালাচামড়ার জন্য নিগৃহীত হতে হোতো। সরকারী মহলের ষড়যন্ত্রের যাঁরা শিকার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ও শশীচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এমন কি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মারফৎ বাঙালীরা যে-সব নরম নরম দাবী তুলেছিলেন তার প্রতিও কটাক্ষ করতে এইসব স্বার্থান্বেষী ইংরেজরা ছাড়েননি। এই আন্দোলন নিয়ে ইংরেজ মহলে যে সব কটাক্ষ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা চলতো তার কিছু নমুনা মেলে সেদিনের ক্যালকাটা রিভিউর পাতা থেকে। এই পত্রিকায় "Charters and Patriots" (Calcutta Review, Vol. 18, No 36, 1852) নামক প্রবন্ধে একজন ইংরেজ লেখক ভারতবাসীর জাতীয় চেতনার প্রতি সহানুভূতির মহড়া করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের চার্টার-আইন সংক্রান্ত অত্যন্ত নরম আবেদনে আতঙ্কিত হোয়ে উঠেছেন। বড়লাটের ক্ষমতা সঙ্কোচের দাবী অথবা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অস্পষ্ট দাবীও তাঁর কাছে অপরিণামদর্শী বাঙালী বাবুদের স্পর্ধা বলে মনে হোলো।

কিন্তু গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া সাহেবদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও রামমোহন ও নব্যবঙ্গ প্রবর্তিত

জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে চলল। অবশ্য যত দিন যেতে লাগল ততই রামমোহন ও নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ফাট লোকের চোখে ধরা পড়ল। ফলে ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলন নব্যবঙ্গের অতিরিক্ত পাশ্চাত্যপ্রীতিকে বাদ দিয়ে তার দুর্বার স্বাধীনতা-স্পৃহাকে গ্রহণ করল, আবার রামমোহনের কাছ থেকে তারা শিখল যুক্তিশীল ধর্মবোধ, স্বাদেশিকতা ও জাতীয় সংযম। তাই পরবর্তী যুগের নেতা অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত্রে দেখা যায় রামমোহন ও নব্যবঙ্গ আন্দোলনের সম্মিলিত প্রভাব। তাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছিল একদিকে রামমোহনের জাতি-গর্বী মনোভাব, স্বাদেশিকতা ও ধর্মপ্রবণতা, অন্যদিকে নব্যবঙ্গের উদ্দাম স্বাধীনতা স্পৃহা ও বলিষ্ঠ গতিশীলতা। এই দুই আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তিতে হোয়েছিল পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

নরহরি কবিরাজ

প্রণাম

বাংলাদেশ, লক্ষগ্রাম,
প্রণাম।

মাঠ-ঘাট-হাটছোঁওয়া পথে পায়ে পায়ে দীর্ঘপথ মাড়াও।
শুকনো মুখ, হায়রে দিন কাটাও
দিনকাল যদিও খুব খারাপ :
খুরঘুটি আঁদির ঘরে বাঁকানো বিষদাঁত-সাপ মনের,
মেঘ নেই জলভরা শুধু স্যাঁতসেতে আবছায়া ঘোর বনের,
আর শেষ কাঠফাটা রোদে যন্দুর চোখ যায় সব ফাঁকাই।
জেরবার মরদ চাষী চোখ তুলে তাকাই আর তাকাই :
বুকফাটা কান্নায় বুক ভাসায়
আমারই ঘরের বউ ঘরে ঘরে, দাউ দাউ আগুন
মাঠভরা ধান লোটে, শেষ চোখ টিপে শত্রুর মুখ হাসায়।
চোখ তুলে তাকাই : এই ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরে আমার
হারানো ছেলের চোখ আচমকা হাতছানি দেয়—তাকাই—
আর ভাবি, এই শেষ।—এই শ্মশানে-মশানে ঘোরা এবার।
চোখ তুলে তাকাই, আর দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে কখন
ছাই-ওড়া কঙ্কালীতলা পেরিয়ে পায়ে-চলা পথ তোমার
ডান দিকে উহরাই ছেড়ে বাঁ-হাতি চড়াই ধ'রে উধাও।...
এরপর আবার মাঠ? মাঠ নয়, মাটির টান সবুজ?
সবুজ ডাক দেবে—ফের দু'হাতে নবান্ন তুলবো গোলায়?
ছাই দিয়ে শত্রুর মুখে উগলোবে লক্ষীর ঝাঁপি আবার?
এরপর?...এরপরও? আজ শুধু তুমি ফিরে ফিরে যখন
বারবার তাকাও, আমি মাঠ-ঘাট-হাট জুড়ে রাখি প্রণাম।

বাংলাদেশ, লক্ষগ্রাম,
প্রণাম।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ট্রেনে

ঝড়ের হাওয়ার মত হু-হু করে ছুটতেছে ট্রেন।
হাওয়ার হাওয়ার চেয়ে ঢের জোরে, বায়ুস্তর ভেদ করে
যেন এক প্লেন।

সামান্য সংখ্যক যাত্রী—তবুও পুরুষ আর তরুণী আছেন
ছোট এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়।
চেয়ে দেখি, শূন্য নভে শাদা শাদা বক উড়ে যায়,
উড়ে যায় বক।
মনের ভিতর থেকে আগুনের আভা যেন রাঙা করে ত্বক।
কারো মুখে কথা নেই ; ভেসে আসে দূরে-দূরে
মাঠ আর শস্যের আঘ্রাণ,
সবুজ হৃদয়ে জাগে গান—
কত গান—গান নয়, মসৃণ মেয়ের চোখে কাঁপিতেছে বুঝি রোশনাই :
রূপালী চাঁদের মত নীল-শাদা কত জ্যোৎস্নাই ;
মনে হয়, স্বপ্নগুলি লুঠ করে দস্যু ব'নে যাই,
যাওয়া যায় নাকি ?
স্বপ্ন কি সবুজ চির অথবা সে সকালে মিলিয়ে যাওয়া শুধুই জোনাকী ?

মেয়েটী কি ভালবাসে ?
তাই কি অমন করে হাসে ?
তুলোর মতন হাসি শাদা-শাদা ছিটোয় হাওয়ায় :
এক ঝাঁক বক উড়ে যায়
পাথায় পাথায়।

মিলায় রঙিন হাসি, স্বপ্ন নেভে, ট্রেন যায় থেমে,
তরুণী-পুরুষ যাত্রী অজানা স্টেশনে গেল নেমে :
আকাশেরো তারায় তারায়
কুঁয়ে কে নেভায় ?

আবার ট্রেনের শব্দ : ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, যেন মনে হয়
সে মেয়েটী কাঁদে :
ঝড়ের পাখীর মত ডানা ঝাপটিয়ে যায় মাঠে কি প্রাসাদে।

ঈগল তির্যক ঠোঁটে যেমন ছোঁ মেরে নেয় শিকার মাটিতে,
তেমনি তড়িৎ বেগে আমি কি পারিনা তারে ছিনায়ে আনিতে ?
আরবার মনে হয়, এই ত খানিক আগে বসেছিল এইখানটিতে।
এখনো মসৃণ গদি উষ্ণই রয়েছে,
হয়ত অনেক কথা লিখে রেখে গেছে
জটিল অক্ষরে :
অজস্র ঢেউয়ের মত কালো-কালো কেশপাশে মেয়েটীর মুখ মনে পড়ে
অপরূপ চ'লে-যাওয়া ঠাট,
ভুরু, নাক, প্রশস্ত ললাট
একটি ছবির মত বার-বার হৃদয়ের শাদা আয়নায়
ভেসে ওঠে—সাবানের ফেণা যেন পাপ্‌ড়ি ফোটায়।

সে মেয়েটী কতদূর ?
হু-হু করে ছোটে ট্রেন, চাকার ঘর্ষণে শব্দ করুণ ঝঙ্কার মত সুর,
—পেরিয়ে এলাম আমি তাকে ছেড়ে অনেক শ্রীপুর।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

হে নায়কগণ

নেতৃত্বের পদলভি স্বার্থান্বেষী হে নায়কগণ
ভুলেছ কর্তব্য তব। বিপথে চালিত করি দেশ
বিধ্বস্ত করেছ তারে। প্রাণশক্তি করেছ নিঃশেষ
শান্তিপ্রিয় মানুষের। জিনিয়াছ যাহাদের মন
বড় বড় বুলি দিয়ে, তাহাদের আর্ত কলতান
শ্রবণে পশে না তব। দারিদ্র্যের কশাঘাতে তারা
জর্জরিত চিরকাল ; বিড়ম্বিত আর সর্বহারা
সেই ক্লিষ্ট জনগণ বুভুক্ষায় আজ ম্রিয়মান।
কর নাই হে নায়ক কোন সমস্যার সমাধান,
মরিয়াছ দিনরাত শুধু কূট রাজনীতি নিয়ে
স্বার্থপরতার বহ্নি চারিদিকে দিয়েছ আলিয়ে
যার বিষময় ফলে হত আজ শত শত প্রাণ।
হে লাঞ্ছিত দেশ মোর, হও আত্মবলে বলীয়ান
যারা স্বার্থান্বেষী, কর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান।

আবদুর রশীদ

গৌরব

(লুই আরাগঁ)

বৈশ্যের মতো দেশের মাটিকে পণ্য
যারা ভাবত না, দেশের মাটির বর্ণ
গায়ে মেখে যারা ফুঁসে উঠেছিল রুখে,
আগুন জ্বলত—আগুন তাদের বুকে,
সেই আগুনের শিখাতেই দুর্জয়
দ্রোহীরা চাইত জীবনের আশ্রয়।

দুঃসহ দুখে কত মেয়ে আঁখিনীরে
সিক্ত কণ্ঠে ভেঙ্গে যেত ধীরে ধীরে
"হায়গো এমন তীব্র শীতের দিনে
কোথায় গো প্রিয় কোথায় সাহসী বীর
কে গান গাইবে, কে নেবে বুকেতে টেনে
ধীরে কথা ক'য়ে কানে কানে অভাগীর ?"

বুকভেঙ্গে-ওঠা মায়েদের নিঃশ্বাস :
শত্রু, শত্রু, অভিশাপ, অভিশাপ,
ঘৃণ্যকে ভয় ক'রে কতদিন যাবে
কতকাল র'ব ভয়ে মন প্রাণ চেপে,
খালিগায়ে হাড় কন্‌কন্ করা শীতে
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বাছারা উঠছে কেঁপে,
আহা কী গরম ছিল সেই রাত, হায়
যে রাতে বাছারা ঘর ছেড়ে চ'লে যায়।

জানি আমি জানি হয়তো এমন রাতে
উষার আশায় খোলা আকাশের নিচে
বাছারা ঘুমোয় শীতে জড়োসড়ো হয়ে,
জলে ও কাদায় সারা দেহ গেছে ভিজে,
সেখানে হয়তো পাহাড়ের কোলে কোলে
আগুন-নেবানো হাওয়া করে ফিস্‌ফাস্
আগুন নিবিয়ে হাওয়া কান পেতে থাকে
তবুও শোনে না ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস।

নেমকহারামী ও প্রহরীর ভয় ভুলে
ভুলে গিয়ে সারা দেশ ও কালের কথা
জোয়ারের শেষে ভাঁটার অপেক্ষায়
দু'চোখে যাদের স্বপ্নের নিবিড়তা
আগুনকে ঘিরে ঘরে ব'সে গুল্‌তানি
যারা করে, তারা শয়তানসঙ্গিনী।

নেমক্‌হারামীর দাম যারা জোরে বেজে
ব'লে চলে—"খুন-খারাপী উচিত কাজ,
"ভালবাসা সেতো নারকীয় মহাপাপ"
বলে গোলামেরা, গায়ে শত্রুর সাজ,
"মুক্তিযুদ্ধে নামে শুধু হীনচেতা।"
ওরা বলে, আর, কালোটাকে বলে সাদা।

আমাদের ছেলে বিদেশীকে বিশ্বাস
কখনো করেনি, গোলামীতে কেনা সুখ
দু'পায়ে মাড়িয়ে, হাসিমুখে নিল চেয়ে
বিপদমৃত্যু, আগ্রহে উৎসুক,
বাছাদের গায়ে ঝ'রে পড়ে আজ সাদা তুষার
শত্রু, শত্রু, ঘৃণ্য তোমার অত্যাচার।

ওঠো, জাগো ফ্রান্স ঘন গৌরবে জাগো,
দাবী কর ফিরে জন্মের অধিকার
তোমার হারানো গৌরব আনে ফিরে,
তোমারই ছেলের সাহসী অঙ্গীকার,
পৃথিবী প্রণতি জানায় তোমার দ্বারে,
যারা ফিরে দিল লুণ্ঠিত সম্মান
ধরা দাও আজ তাদের আলিঙ্গনে,
তারাই তোমার বিজয়ী সুসন্তান।

বিজিত হয়েছে ফ্রান্স কে আজ বলে
কে বলে মুয়েছে ফ্রান্সের সন্তান
দেশপ্রেমিক জানে না নোয়াতে মাথা
জানে না করতে শত্রুকে সম্মান।
আমাদের হোক গৌরবে উচুঁ শির
স্বাগত স্বাগত অজেয় 'মাকিস্' বীর

দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ততম অধ্যায়

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে অদ্ভুত সচল বলে মনে হবে। প্রথম পরীক্ষামূলক যুগটার উপর খুব তাড়াতাড়ি দাঁড়ি টেনে দিয়ে তীক্ষ্ণ ফলার মত কলম নিয়ে আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেই সঙ্গে শুরু হল আধুনিক বাংলাসাহিত্যের পূর্ণ যৌবনাবস্থা। বঙ্কিম থাকতে থাকতেই নতুন ধারা এবং নতুন যুগ নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ; আবার রবীন্দ্রনাথ যখন সবে মধ্যাকাশে তখন আরও নতুনতর সুর নিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্য অভিযান শুরু করলেন। এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের তিন শতাব্দী-ব্যাপী দীর্ঘ সাহিত্য-আন্দোলনের সব কয়টা সুরই মোটামুটি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। কাজেই বাংলা সাহিত্যের অগ্রাভিযান অব্যাহতই ছিল; আধুনিক বাংলা সাহিত্য বরাবরই আধুনিক। এ-কথা সহজ বোধের থেকে সবাই মেনে নিয়েছে; সাড়ম্বরে জাহির করবার কেউই তেমন দরকার বোধ করেননি। কিন্তু ১৯২৫ এর ঘর থেকে হঠাৎ যেন বাংলা সাহিত্যের যৌবনের বেগ বেড়ে গেল। যে-বাংলা সাহিত্য সব সময়েই সচল, সব সময়েই আধুনিক, তাকে জড় অপবাদ দিয়ে সেই জড়ত্ব ভাঙার জন্য একদল তরুণ সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সব সময়ের সাহিত্যই তখনকার যুগে আধুনিক। কিন্তু সেই অতি অনুজ্জ্বল বিশেষণে এই নব্য লেখক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি ছিল না। নিজেদের ব্যাক্‌ব্রাশ করা চুলের নিচেকার নাতিপ্রশস্ত কপালে তাঁরা নতুন ছাপ লাগিয়ে নিলেন: 'অতি আধুনিক'।

কিন্তু অতি-আধুনিক কেন? শব্দটার দ্বারা এই কথাই কি মনে হয় না যে আধুনিক পর্যায়ভুক্ত আর একটা সমসাময়িক সাহিত্য তখন সক্রিয় যার থেকে এই নব্য লেখক-সম্প্রদায় নিজেদের এতখানি পৃথক বোধ করেছেন যে একটা নতুন বিশেষণের প্রয়োগের দরকার বোধ করেছেন নিজেদের ধারালো স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য? এই স্বাতন্ত্র্যটা বিশ্লেষণ করা দরকার সকলের আগে। এক হতে পারে এই স্বাতন্ত্র্য অতি বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তা জীবনকে একটা নতুন দৃষ্টিকোণের থেকে দেখার প্রচেষ্টা—এমন প্রচেষ্টা যার সঙ্গে অন্য ধরনের সাহিত্যের কোনো সন্ধি চলে না। আবার এমনও হতে পারে, এই স্বাতন্ত্র্য কোনো সত্যিকারের স্বাতন্ত্র্য নয়; এবং সত্যিকারের স্বাতন্ত্র্য নয় বলেই হয়তো আত্মগরিমাও বেশি, অন্য সাহিত্যের প্রতি উষ্মাও বেশি।

জিনিসটা গোড়ার থেকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করা যাক। সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক ভাষাতে একটা যোগাযোগ আছে। সাহিত্যের আগেই এই ভাষা পুরোনো পুঁথির ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে। এই বিদ্রোহ হল চলিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে চালু করার চেষ্টা; এবং তার প্রথম কর্ণধার হিসাবে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকা বের করেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সহকর্মী প্রভৃতিকে নিয়ে 'আর্টের জন্য আর্ট' এই মতবাদকে কেন্দ্র করে সাহিত্য এবং সমালোচনা গড়ে তোলার মনোযোগ দিয়েছেন। নতুন ভাষা

তাঁরাই প্রথম শুরু করেন; কিন্তু অতি-আধুনিকতার গর্ব তাঁদের ছিল না। সেটা এল আর এক পুরুষ পরে। প্রথমে 'কল্লোল', 'কালি কলম' এবং 'প্রগতি' এই তিনখানা পত্রিকার মারফৎ অতি-আধুনিকদের অভিযান শুরু হয়। প্রমথ চৌধুরীর নতুন ভাষাকে তাঁরা গ্রহণ করলেন; কিন্তু সাহিত্যের মতবাদের বেলায় এসে তাঁরা প্রমথ চৌধুরীর দলের মতো স্পষ্ট অথচ নতুন কোনো ভাববারাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন বলে জানি না। অবিশ্যি সেই সময় তাঁদের বয়স কম ছিল। সেই জন্যই তখন তাঁদের লেখার ধার ছিল, ভার ছিল না।

আর কিছুদিন পর থেকেই এই নব্য সম্প্রদায় পত্রিকার গহ্বর থেকে বের হয়ে এসে বই প্রকাশে মনোযোগ দিলেন। এই সময়কার সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার যেটা সেটা হল এই যে, একটা ভয়ংকর নতুন কিছু করছেন বলে যাঁরা সাহিত্যিক এবং যুবক মহলে তুমুল আলোচনা তুললেন, যার ফলে ইস্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত বলতে শুরু করল 'ultra-modern' এবং 'the big four' (মানে, বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-প্রবোধ এই সাহিত্যিক চতুষ্টয়) তাঁদের এই জমকালো আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে জনসমাজে প্রকাশ করার চেষ্টা অত্যন্ত কম দেখা গেল। 'বিচিত্রা' 'ভারতবর্ষ', 'পূর্বাশা', এবং এমনি দু'একটা পত্রিকাতে কেউ কেউ (তাঁদের মধ্যে সাহিত্যরথী চতুষ্টয়ের সাক্ষাৎ মেলে বড় কদাচিৎ) অতি-আধুনিকদের সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ মাঝে মাঝে লিখতেন। তার মধ্যে এই নতুন সাহিত্যের আলোচনা এবং পরিচয় কোনোটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বস্তুত সমালোচনার ক্ষেত্রে এতখানি অনুর্বর দশা বাংলায় কোনোদিন দেখা যায়নি। পূর্ববর্তী কত সাহিত্যরথীই এসেছেন, সবাই বোধ করেছেন, যে-দৃষ্টিকোণকে ভিত করে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা পাঠকশ্রেণীকে তাঁদের সৃজনী সাহিত্যের থেকে খুঁজে বের করার অবকাশ না দিয়ে নিজেদেরই কিছু কিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া উচিত। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রমথ সবাই কম-বেশি এই মনোভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রথম ব্যতিক্রম আনলেন অতি-আধুনিকরা। তার কারণ কি এই যে সব প্রথম তাঁরা যে অতি জমকালো বিশেষণ গ্রহণ করলেন তার প্রকৃতির সঙ্গে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি।

সমালোচনা যে একেবারে ছিল না তা নয়। তার মধ্যে পুরোনো সাহিত্যের আদর্শবাদ, সুচিতা এবং অবাস্তবতার বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ থাকত প্রচুর, কিন্তু নতুন সাহিত্যের কথা কখনো স্পষ্ট করে থাকত না। প্রবোধ সান্যাল তো শরৎ সাহিত্যের আলোচনায় শুধু অশ্লীল হোতে বাকী রেখেছিলেন। কিন্তু ওই প্রাচীন সাহিত্যের বিচারে মাপকাঠির স্থিরতা ছিল না: কখনো মাপকাঠি বস্তুতন্ত্রবাদ কখনো বা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব-বাদ;—অথচ না বস্তুতন্ত্রবাদ না মনস্তত্ত্ববাদের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে; এখন ঠিক স্পষ্ট করে সময়টা মনে পড়ছে না, তবে যেন কয়েক বছর আগে দিলীপকুমারের সঙ্গে আরও কয়েকজন সাহিত্যিকের 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই নীতি নিয়ে একটা ভীষণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়, এবং সে বিতর্কে বুদ্ধদেব বসুও যোগ দেন। 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই নীতির সঙ্গে তাঁর কোনো গুরুতর বিরোধ ছিল না, তবে তিনি 'লেখকের জন্যই আর্ট' বা Art for my sake এই প্রবচনটির প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রবচনটি অবিশ্যি ইংরেজ লেখক লরেন্সের থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া আরও দু'চার জায়গায় বুদ্ধদেববাবুর সমালোচনা প্রচেষ্টা দেখা গেছে। একটি প্রবন্ধের নাম যেমন 'গ্রীষ্ম যাপন ও জর্জীয় উপন্যাস' (পূর্বাশা, সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জুবিলী

সংখ্যা)। এই প্রবন্ধ পড়ে জর্জীয় উপন্যাস সম্বন্ধে কোনো ধারণা না হোক, সে উপন্যাস যে বুদ্ধদেব বসুর খুব ভাল লাগে তা বুঝতে কারও বেগ পেতে হয় না। অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচনার বেলায় তিনি কখনোই বৈশ্লেষণী পন্থা নেননি, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিই ছিল বিচারের চরম এবং পরম মানদণ্ড।

কাজেই ১৯২৫এর থেকে ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত যে-অভিনব আন্দোলন চলেছে বাংলা সাহিত্যে, এই সময়কার সাহিত্য আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সময়কার সৃজনী সাহিত্যের থেকেই এই আন্দোলনের মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করা ছাড়া আর গতি নেই। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার আগে এটুকু পরিষ্কার থাকা দরকার যে বিশেষরকম উল্লেখ না থাকলে সব সময়েই ধরে নিতে হবে যে উপরোক্ত সময়ের মধ্যে লিখিত রচনাসমূহের প্রসঙ্গেই শুধু আলোচনা চলেছে। এই সময়ের লেখকদের প্রায় সবাই আজও সাহিত্যের আসরে কম-বেশি সক্রিয়; কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যাতে তাঁদের আধুনিক লেখাগুলিকে বর্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। স্পষ্টই বোঝা যায় ১৯২৫ এর আগে সাহিত্যে যে-ধারা ছিল অনুপস্থিত এবং ১৯৩৭-এর পর থেকে অত্যন্ত অলক্ষ্যে যে-ধারা আস্তে আস্তে লুকিয়ে গেছে, তাকে একটা বিশিষ্ট যুগ বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। দুর্বলতা যদি থেকেও থাকে তা সত্ত্বেও এই ধারাকে নতুন যুগের মর্যাদা দিয়ে ঠিক তদনুযায়ী মনোযোগ সঙ্গেই বিচার করা প্রয়োজন।

অতি-আধুনিক নব্য লেখকেরা আত্মব্যাখ্যায় অপারগ হয়ে থাকলেও তাঁদের মধ্যে যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল তা মানতেই হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর দিলে সকলের আগে চোখে পড়ে একটা নতুন প্রাণের স্পন্দন, যেন একটা স্থিতিশীলতাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে নব উন্মাদনা এসেছে সাহিত্যে। আঘাতের উত্তেজনায় এই সাহিত্যের ভাষা হয়েছে ক্ষুরধার; তার সঙ্গে উৎসাহ আর স্ফূর্তিরও যেন আর সীমা নেই। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলাভাষা ধাপে ধাপে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে; নব্য লেখক সম্প্রদায়ের অত ধৈর্য ছিল না। তাঁরা একেবারে হঠাৎ ভাষায় নতুন কায়দা, এমন-কি, অপ্রচলিত শব্দবিন্যাস পর্যন্ত শুরু করলেন। তাঁদের উপমাগুলি পর্যন্ত অর্থের আকস্মিকতায় সাধারণ পাঠকের মনে একই সঙ্গে কৌতুক এবং বিরক্তির জন্ম দিয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসুই বোধকরি ভাষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই জোয়ারের বেগ শুধু ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা সাহিত্যের এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত ঘটনা-প্রধান টেকনিকের উপরও আঘাত করে নতুন কথোপকথন-প্রধান টেকনিকের যেমন জন্ম দিল, তেমনি আবার আমদানি করল এক ধরনের অতি উজ্জ্বল, বেশভূষায় এবং কথাবার্তায় অত্যন্ত ধারালো ছেলে এবং মেয়ে চরিত্র। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তারা যেন মূর্তিমান বিদ্রোহ, যেন আমাদের প্রচলিত বাঙালীর ভীরু চরিত্রকে বিপ্লবের আগুনে পুড়িয়ে দেবার জন্যেই তাদের জন্ম। অবিশ্যি একটু বিশ্লেষণ করলে এ-ও বোঝা যায় যে, এইসব চরিত্রের মধ্যে যা আছে তা হল স্ফুলিঙ্গ, বিপ্লব নয়; উৎসাহ উদ্দীপনার পরিচয় শুধু এইটুকুই নয়, আরও আছে। খুব তাড়াতাড়ি করে বাংলায় অনেকগুলি সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা এই সময়ের মধ্যে বেরিয়েছে; তাদের

অধিকাংশই স্বল্পায়ু হলেও অধিকাংশই আবার নব্য-লেখকবৃন্দ কর্তৃক সৃষ্ট নতুন কায়দায় ভরপুর। এমন-কি পুরোনো রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি পর্যন্ত এই নতুন ধারার কাছে কম-বেশি আত্মসমর্পণ করে নতুন কায়দার লেখাকে স্থান দিচ্ছিল। পত্রিকার সংখ্যার বিস্তৃতির সঙ্গে লেখক সংখ্যার বিস্তারও উল্লেখযোগ্য। এক নিশ্বাসে আমরা বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, এই কয়জন লেখকের নাম করতে পারি, যাঁরা সবাই এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের সংখ্যা যে এর কয়েকগুণ হবে তা না বললেও বোধকরি চলে।

কাজেই স্বভাবত এই প্রশ্ন জাগে যে, যে-নতুন ধারার মধ্যে ভাষা, চরিত্রাংকন, প্রসার, সব দিক দিয়েই এত নব জোয়ার, এত প্রাণাবেগের পরিচয় পাই, তার নব জোয়ারের বাস্তবিক উৎস কোথায়? বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁস হিসাবে যদি বঙ্কিম যুগকে ধরি, তো তার সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যের দিক দিয়ে যেন এই নতুন ধারার একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবিশ্যি সেটুকু বাদ দিলে বঙ্কিমযুগের সঙ্গে এই অতি-আধুনিকদের পার্থক্যটা আরও স্পষ্ট। বঙ্কিমযুগের সামনে একটা স্বপ্রাচ্ছন্ন অতীত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল। তাঁরা সমসাময়িক সমাজকে সুনির্ধারিত জাতীয়তাবাদের পথে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার মত বলিষ্ঠ জীবন-নীতি দিতে পেরেছিলেন কিন্তু অতি-আধুনিকরা অতীতকে বিশ্বাস করেন না; এবং ভবিষ্যতের মিথ্যা স্বপ্ন দেখাকেও কাপুরুষতা বলে মনে করেন। ফলে জীবন সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সুস্পষ্ট মতবাদ নেই এবং সেইজন্যেই তাঁদের হাত থেকে কোনো সুচিন্তিত সাহিত্য আলোচনা বা প্রবন্ধ বের হয়নি। বস্তুর দিক দিয়ে যাঁদের এত দৈন্য তাঁদের আবার এত প্রাণাবেগ, এত উচ্ছ্বাস আসে কোথা থেকে? সাবানের ফেনার মত অবলম্বনহীন স্ফীতি কি জীবন বা সাহিত্যের বেলায়ও সম্ভবপর?

আমাদের জীবনে যে-সব উজ্জ্বল দিন আসে, তা কখনোই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অতি-আধুনিকদের প্রাণ-চাঞ্চল্যও শূন্যশ্রী তো নয়ই, বরং যত ক্ষীণভাবেই হোক, একটা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচ্ছন্ন প্রয়োজন তাঁদের মধ্যে নিহিত ছিল। সেই প্রয়োজনটা হল আমাদের দেশের সমাজের উপরকার প্রবল সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবের উপর শেষ চূড়ান্ত আঘাত হানা। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের ক্রোড়ে পালিত ক্ষীণজীবী বুর্জোয়া শ্রেণী কোনোদিনই সামন্ততন্ত্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তি নিয়োজিত করতে পারেনি। তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব শুধু সমাজেই আবদ্ধ ছিল না, তা বাংলার উপর সাহিত্যকেও আচ্ছন্ন করে রাখতে প্রয়াস পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, শরৎচন্দ্রের লেখায় পর্যন্ত যখন আমরা অনেক সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেখতে পাই, তখন এ-কথা যে কতখানি সত্য তা বুঝতে পারা যায়। কাজেই যত বিলম্বেই হোক, সাহিত্যে যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার দরকার ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই, অতি-আধুনিক সাহিত্য এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে অগ্রসর হল। একমাত্র অতি-আধুনিক সাহিত্যই সর্বপ্রথম সূক্ষ্মভাবেও সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দেয়নি। শুধু তাই নয়, কতকগুলি ক্ষেত্রে তারা রীতিমত বিদ্রোহের পরিচয় দিয়েছে। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গেলেও কয়েকটা প্রধান প্রধান

বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। এবং তার ভিতর থেকে এ জিনিসটাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে, আমাদের সমাজের যে-সমস্ত দিকে সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি সবচেয়ে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, অতি আধুনিক উপন্যাস তার সবচেয়ে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছে ঠিক সেইসব ক্ষেত্রে। সামন্ত-রীতির বিরুদ্ধে এইসব উপন্যাসের প্রকৃতিটা বুঝতে গেলে কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করলেই চলবে। প্রথমত ধরা যাক, বর্ণ-বৈষম্যের কথা। ইতিপূর্বে প্রায় অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিকই সুকৌশলে অসবর্ণ বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। আকস্মিক ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রেম এবং প্রেমের ভিতর দিয়ে বিয়ে অনেক বইএর বিষয়বস্তু হয়েছে, কিন্তু এমন আকস্মিকতার মধ্যেও বর্ণগত মিল ঘটে যাওয়াটা আধুনিক পাঠকদের কাছে আরও আকস্মিক বলে বোধ হয়েছে। অতি-আধুনিকরা এসে অসবর্ণ প্রেম এবং তার পরিণতি হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিয়োগান্ত ঘটনার অবতারণা করে সামন্ত-রীতির কাছে আত্মসমর্পণের থেকে বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়েছেন। বর্ণ বৈষম্যটা আমাদের সমাজের যে একটা সমস্যা এটাকে একরকম অস্বীকার করে এমন বইও লেখা হয়েছে যার মধ্যে নায়ক-নায়িকার নামের মধ্যে বর্ণ জ্ঞাপক পদবীর পর্যন্ত দেখা মেলে না। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিয়ে অতি-আধুনিক উপন্যাস সামন্ততান্ত্রিক প্রভু, যথা, পিতা, অভিভাবক, সমাজপতি, —এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এসব প্রভুদের অনুশাসনকে মানতে না পেরে আধুনিক নায়ক অনায়াসে সমাজ-বিগর্হিত প্রেমে মেতে উঠেছে, আধুনিক নায়িকা বারবার করে পিতার শাসন-প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে। ফল অনেক সময়েই ভাল হয়নি; আমাদের ভাঙনধরা সমাজের শক্তির কাছেও ব্যক্তি বিশেষের বিদ্রোহ কেবল চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ই টেনে এনেছে। অতি আধুনিক লেখকদের এই পরাজয়ে দুঃখ নেই; পরাজয়ের ভিতর দিয়েও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বাক্ষর যদি তাঁরা বই-এর পাতায় পরিষ্কার করে রেখে যেতে পারেন তো তা হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কিন্তু অতি আধুনিকরা সব চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন যে জিনিসটার উপর সেটা হল সতীত্ব এবং চরিত্রের উপর সামন্ততান্ত্রিক মন যে গুরু মূল্য আরোপ করেছে তার বিরুদ্ধে। আর আধুনিকরা ফ্রয়েড পড়েছেন এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছু তিক্ততা, বিরক্তি, পাগলামী প্রভৃতির পিছনে আছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী রুদ্ধ-রতির অসাধারণ ক্ষমতা। ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে অতি-আধুনিকরা যৌন-সর্বস্বতাকে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি হিসাবে ধরেছেন; যৌন-স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই এই আদিম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সম্ভব এবং সেই সঙ্গে আধুনিক মানুষের অধিকাংশ মানসিক রোগেরও অবসান ঘটবে। এই ধারণার ভিতরও যে অত্যন্ত অগোচরে আর একটা বিস্মৃতি এসে ঢুকেছে তার আলোচনা পরে করা চলবে। কিন্তু এইখানে স্বীকার করতেই হবে যে সতীত্ব-বিরোধী অভিযানের ভিতর দিয়ে শতকরা যে পঞ্চাশ জন মানুষকে সামন্ততন্ত্র সতীত্বের নামে পুরুষের চির অধীনতায় আবদ্ধ করে রেখেছিল তারা সর্বপ্রথম তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। সামন্তরীতির প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, মেয়েরা জাতি-হিসাবে সহজেই বিপথগামিনী; অতএব তাদের সর্বদাই পুরুষের অভিভাবকত্ব মেনে চলতে হবে। অতি-আধুনিকরা এই

অভিভাবকত্বের দাবী অস্বীকার করে ঘোষণা করলেন সতীত্ব তেমন কিছু একটা মূল্যবান পদার্থ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি দামী মেয়েদের স্বাধীন অধিকার। ঠিক তেমনি করে সতীত্ব বা ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধেও নতুন মত হল এই যে, ওটা আসলে সামন্ততান্ত্রিক পুরোহিত-শাসন অব্যাহত রাখার ফিকির মাত্র; আসলে সতীত্বের আবার একটা মূল্য কি? সমাজ জীবনে কতকগুলো ব্যাধি সৃষ্টি করা ছাড়া তার আর তো কোনো কাজ নেই।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতির বিরুদ্ধে অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিদ্রোহের দু'তিনটে দিক দেখানো গেল। কিন্তু পুরোনো সমাজনীতিকে ভাঙতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজ নীতির কথা বলতে হয়। অতি-আধুনিকরাও তা বলেছেন। তাঁদের কাছে নতুন সমাজের মূলনীতি হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা; অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজাদর্শ যা হয়ে থাকে তাই। কিন্তু অতি-আধুনিকদের হাতে এই দুটো জিনিস এমন এক স্তরে গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা, একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবন একেবারে অবান্তর হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা মানে হল স্রেফ ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রসঙ্গে যে সচেতনভাবে কতকগুলো নিয়ম মেনে চললে তবেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি করে স্ফূর্তি লাভ করে এ-কথা অতি আধুনিকরা একেবারেই মনে করেননি। অবিশ্যি এতখানি চরমপন্থী যাঁরা নন তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু সমাজ-নীতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়। ডিভোর্স, মেয়েদের পুনর্বিবাহ, বিয়ের আগে প্রেম, যৌথ পরিবারের বদলে স্বামী-স্ত্রী-কেন্দ্রিক পরিবার প্রভৃতি জাতিগুলি মোটামুটিভাবে সর্ববাদী স্বীকৃত বলে ধরা যায়।

আবার বলি, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান এবং নতুন বুর্জোয়া নীতি প্রচার, এ-দুটো জিনিসই অতি-আধুনিকদের নতুন আবিষ্কার নয়। বাংলা সাহিত্যে এ জিনিস যথেষ্ট পুরাতন। বরং শরৎচন্দ্র এবং নরেশ সেনগুপ্তর মধ্যে এইগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচিত এবং প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আধুনিক লেখকদের বরং না আছে তেমন ধৈর্য না তেমন বুদ্ধি এবং যুক্তির তীক্ষ্ণতা। কিন্তু তবু শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সবাই কখনো না কখনো সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' এবং 'বিপ্রদাস' সতীত্বের একেবারে আদর্শ। অতি আধুনিকরাই সর্বপ্রথম সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে রীতিমত অসহিষ্ণু ঘৃণার ভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন; তাঁদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক দুর্বলতার নিঃসাড়ে প্রবেশ অত্যন্ত দুর্লভ। বুর্জোয়া নীতির প্রতি এই সততাই অতি-আধুনিকদের সমর্থনের সব চেয়ে বড় যুক্তি; এবং একে কেন্দ্র করেই নতুন ভাষা এবং টেকনিক কিছুটা সাফল্য অর্জন করে অন্তত একটা সীমাবদ্ধ মহলে একসময়ে যথেষ্ট আলোচনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

অবশ্যি এই নতুন বুর্জোয়া নীতির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অতি-আধুনিকদের পথ-প্রদর্শকেরও অভাব ছিল না, সহযোগীরও অভাব ছিল না। নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার গৃহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সামন্ততান্ত্রিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত নীতি বদলাতেই হবে—এ নিয়ে অনেক আগেই কলম ধরেছিলেন ইব্‌সেন। তারপর বার্নার্ড শ', বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল (উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধে)-এর নাম স্বভাবতই এসে পড়ে। লরেন্স এবং অল্‌ডাস হাক্সলী এই দুইজনকে অতি-আধুনিকদের একরকম সমসাময়িক বলে ধরা চলে। আমেরিকান যৌন-বিজ্ঞানবিদ্ বেন্ লিণ্ডসের নামও এই প্রসঙ্গে বাদ দেওয়া চলে না। ইউরোপ এবং

আমেরিকার এই সব লেখকরা যখন সমাজে নতুন নীতির জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাঁদের দেশগুলিতে তখন বুর্জোয়া সভ্যতার নিতান্ত পরিণত অবস্থা। আইনের অসুবিধা সত্ত্বেও এই সব দেশে অনেকদিন থেকেই অর্থনৈতিক জীবনের অনিবার্য প্রভাবে এই সব নীতি কম-বেশি অনুসৃত হতে শুরু হয়েছে। লেখকেরা এইগুলিকে একটা কাগজ কলমের সমর্থন দিতে চেষ্টা করেছেন এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবকে চূড়ান্তভাবে দূর করতে চেয়েছেন। কিন্তু বুর্জোয়াতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থার সন্তান বলে এই সব সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখকরা যে সত্যিকারের সুস্থ নীতির কথা বলতে পেরেছেন একথা বলা চলে না। ভারতবর্ষের অবস্থা এই অবস্থার থেকে অনেকখানি ভিন্ন ছিল। কাজেই পাশ্চাত্য লেখকদের সঙ্গে অতি-আধুনিকদের সংযোগ নির্ধারণের সময় ভারতবর্ষেরও এই সময়ের বিশিষ্ট সামাজিক অবস্থানের কথা আলোচনা করা দরকার।

১৯২৫-এর ভারতবর্ষের অবস্থা কী ছিল? অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর দেশের ভিতর স্বভাবতই ব্যাপক হতাশার ভাব তীব্র হয়ে উঠেছে। আন্দোলন আরম্ভের সময়ে পুরোভাগের সৈনিকগণ, অর্থাৎ দেশের বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে এই আশা ছিল যে যে-শক্তি তাঁরা নিয়োজিত করবেন তা তাঁদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। আশাতীতরকম ভাবে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমাদের তুলনায় প্রতিপক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী। পরাজয় যখন এল, সঙ্গে এল যাবতীয় পরাজয়ের মনোবৃত্তি। দেশবাসী ভাবল এতবড় প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বৃথা। বিদেশী শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃণা চতুর্গুণ বেড়ে গেল, কিন্তু সে-ঘৃণা স্ফুলিঙ্গের আকারে দেখা দেবার সম্ভাবনা সাময়িকভাবে লোপ পেল। এই যে তীব্র রাজনৈতিক হতাশা, নিরাশা—এর প্রতিক্রিয়া থেকেই জন্ম হল অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের। তার প্রথম প্রকাশ হল রাজনীতিবিমুখতায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমের সাহিত্যে তাঁর সময়কার রাজনীতির পুরোপুরি স্ফুরণ আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত আমরা রাজনীতিক আন্দোলনের পরিচয় পাই, শরৎ এবং শরৎ-সমসাময়িক সাহিত্যে প্রচুর না হলেও দেশাত্মবোধের বিস্তর সাক্ষাৎ মেলে। ব্যতিক্রম আনলেন অতি-আধুনিক সাহিত্যিকরা। তাঁরা একেবারে সদলবলে রাজনীতিকে বর্জন করে সাহিত্য চর্চা করতে বসলেন। 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই ধ্বজা তুলে তাঁরা বলতে চাইলেন রাজনীতির প্রচার আর্টের পরিপন্থী, অতএব বর্জনীয়। আসলে কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের পরাজয়ে দেশ জোড়া প্রতিক্রিয়ারই অবধারিত ছায়া পড়েছে তাঁদের লেখার মধ্যে।

ব্যর্থতার অজুহাতে রাজনীতিকে বাদ দেওয়া গেল বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের সামনে আরও তো সংগ্রামের অভাব ছিল না। নতুন অর্থনৈতিক জীবন যে নতুন মানসিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছিল বুর্জোয়া সভ্যতার আংশিক প্রয়োগ, তার পরিপূর্ণ চরিতার্থতায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদ আর একদিকে সামন্ততন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদকে অতি শক্তিশালী মনে করায় সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে স্বভাবতই অতি-আধুনিক লেখক-সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্র-বিরোধী অভিযানে লিপ্ত হয়ে পড়লেন।

দেশ কিন্তু আবার আস্তে আস্তে অসহযোগ আন্দোলনে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে

উঠে সংগ্রামের নেশায় মেতে উঠল। নরমপন্থীদের আপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার দাবী হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করতে বাধ্য হল। শীঘ্রই শুরু হল ১৯৩০-এর অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন। এবারকার আন্দোলন হল আরও জোরালো, আরও ব্যাপক। কিন্তু এই বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগ্রাম-লিপ্সা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের পরাজয়ের বীজ তার শুরুতেই বোনা হয়ে গিয়েছিল। সেটা হল দেশের শ্রমিক এবং কৃষক প্রমুখ সমগ্র জনসাধারণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করার বুর্জোয়া শ্রেণীর অসামর্থ্য। ১৯২১-এর পুরানো সংগ্রাম-কৌশলই এবারও অনুসৃত হল। সমগ্র জনসাধারণকে একত্র না করলে যে স্বাধীনতা আসে না নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়ারা তা ভাবতে পারলেন না বরং স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাতেই গণ-বিপ্লবভীত বুর্জোয়া নেতৃত্ব আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। জনসাধারণ সম্বন্ধে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাব অদ্ভুত। একমাত্র কৃষক এবং মজুর জনসাধারণই যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করে সবচেয়ে বেশি সাহসের সঙ্গে গণ-বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বুর্জোয়া শ্রেণীর এ-বিষয়ে আস্থার অভাব। য়ুরোপের উনবিংশ শতকের বিপ্লবের ইতিহাস এখানে কোনো শিক্ষা জোগাতে পারেনি। কিন্তু জনসাধারণের প্রতি এই অনাস্থার সঙ্গে জনসাধারণ-ভীতিরও আবার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বঞ্চিত হলেও বিশ্ব-বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ হিসাবে বিশ্ব-বুর্জোয়ার বোলশেভিক ভীতির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের জাগ্রত সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা আসতে পারে না এই বিশ্বাস যেমন নেই, তেমনি আবার জনসাধারণ আন্দোলনের ভিতর এসে পড়লে তার ভিতর দিয়ে তার নিজস্ব কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এ-আশঙ্কাও অত্যন্ত বাস্তব। তার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব কৃষক এবং মজুর সাধারণকে পাশ কাটিয়ে যাবার ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের বশীভূত হয়ে নিজের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই বাস্তবিক করে তোলার পথকে ক্রমশ রোধ করে ফেলেছে। এই কারণেই ১৯৩০-এর বিরাট আন্দোলনেরও চূড়ান্ত সাফল্য লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এই ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে দুটো অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। প্রথমত, ১৯০৫-এর থেকে ১৯২১ পর্যন্ত যেভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমবর্ধমান হারে দুর্দমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে তার আন্দোলনের সামর্থ্য অনুসারে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার এবং তার ভিতর দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলায় মনোযোগ দিয়েছিল; ১৯২১-এর পর থেকে যখন সত্যিই আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে, তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্তে আস্তে সেই দুর্দমনীয় দৃঢ়তায় ভাটা পড়ে এসেছে। ১৯৩০-এর মূলমন্ত্র ছিল: আন্দোলন বিস্তারই বড় কথা নয়, বড় কথা হল আন্দোলনের গুণগত মান উঁচু রাখা, অর্থাৎ অহিংসার আদর্শ বজায় থাকা। দেশের সমস্ত লোক, সমস্ত দলকে আন্দোলনের ভিতর টেনে এনে দুর্জয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেমন করেই হোক স্বাধীনতা আনব এই প্রবল দৃঢ়তা এবং জয়াভিলাষ ইতিমধ্যেই স্তিমিত হয়ে এসেছে; ইতিহাস প্রমাণ করে যে তা আরও ক্ষীণতর হতে চলেছে। ৭০ বছর আগের বঙ্কিমচন্দ্র যতখানি কৃষকের কথা ভেবেছেন, ১৯৩০-এ গান্ধীজী অনেক বেশি রাজনীতি-সচেতন কৃষকদের মধ্যে দাঁড়িয়েও তা ভাবেননি। তার ফলে ক্রমশ সংগ্রামের চেয়ে আপোসনীতির ভিতর

দিয়েই স্বাধীনতা আনা সম্ভব হবে এই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের নীতি আবার প্রধান হয়ে উঠল। স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার অসামর্থ্য এবং অনিচ্ছার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজের চেষ্টায় স্বাধীনতা আনার সম্ভাবনা গেল লোপ, জয়লাভ করার দৃঢ়তা হল হ্রাস। এই পরিস্থিতি কায়েম হবার ফলে বুর্জোয়াকে দ্বিতীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। জনসাধারণের নিজস্ব আন্দোলন এবং তার ভিতর দিয়ে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে শুরু করল। জনসাধারণের সম্পর্কচ্যুত বুর্জোয়া নেতৃত্বের থেকে সাহায্যের চেয়ে বাধা বেশি পাওয়ার ফলে এই গণ-আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান দ্রুতবেগে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে শুরু করল। নতুন তার উদ্যম এবং আশা, তার সামনে সমুজ্জ্বল সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ। ফলে ক্রমশ এই সম্ভাবনাই বেড়ে উঠতে লাগল যে, জনসাধারণের আপন প্রয়োজনেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণ-প্রতিষ্ঠানকেই নিজস্ব পদ্ধতিতে ভাবতে শুরু করতে হবে। সেইটে যখন কাজে পরিণত হল তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগও ক্রমেই জনসাধারণের হাতে আসতে লাগল। জনসাধারণেরই বুর্জোয়া শ্রেণীকে পথ দেখানোর দায়িত্ব নিতে হল। সেইজন্যই বর্তমানে দেখা গেল যে, কংগ্রেস ফাশিস্ট-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না; বরং জনসাধারণের নিজস্ব অন্য প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করে কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টায় লেগে গেছে।

এই দ্বিবিধ অবস্থার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হল এই যে বুর্জোয়া শ্রেণী পৃথিবীর অন্য সব জায়গার মত ভারতেও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে এল। তার সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনের ভিতর দিয়ে বিস্তার এবং সম্পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার কর্মপ্রেরণার মধ্যে এমন জোর রইল না যা দিয়ে উপযুক্ত দৃঢ়তা, সাহস এবং আশার সঙ্গে সে পথ করে চলতে পারে। আপন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে কেবল সংকীর্ণ বর্তমানের মধ্যেই আঁকুপাঁকু করতে লাগল, তার ফলেই জন্ম নিল একদিকে আপোস-মনোবৃত্তি, আর একদিকে ১৯০৫-এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ। অর্থাৎ সন্তার বাজীমাৎ করার অভিলাষ। তারপর ক্রমশই বুর্জোয়া শ্রেণীহিসাবে অপটু হয়ে আসতে লাগল। বর্তমানের নিদারুণতম খাদ্য এবং রাজনৈতিক সংকটের দিনে বুর্জোয়া দেশভক্তদের নিশ্চেষ্টতা তো সকলের চোখের সামনেই প্রকাশমান।

এই প্রতিক্রিয়া-প্রবণ বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনীতি কিভাবে অতি-আধুনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার আলোচনা করা যাক। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তৃতি আর চাই না, তার থেকে বোঝা গেল বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজস্ব চেষ্টায় স্বাধীনতা আসার আর সম্ভাবনা নেই। ১৯২১-এর পর থেকে পরাজয়ের অবসাদ হেতু রাজনৈতিক বিরূপতাই সাহিত্যে আস্তে আস্তে এই নতুন মনস্তত্ত্ব চর্চা স্থায়ী হয়ে উঠল। সাহিত্য তার উদ্দেশ্য, তার ভবিষ্যৎ হারিয়ে ফেলল। দেশের জাতীয় চেতনা উদ্বোধন করা বা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো উদ্দেশ্যই সাহিত্যের থাকতে পারে না, সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দ পরিবেশন। প্রমথ চৌধুরী এইভাবে যে 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির প্রবর্তন করলেন তারই অত্যন্ত বাস্তব প্রয়োগ হয়ে উঠল অতি-আধুনিকদের মূলমন্ত্র। ১৯০৫-এর সমাচার সাহিত্যে জাতীয় চেতনার সাক্ষ্য ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, ১৯২৫-এর সময় এবং তার আগেও জাতীয় ভাবধারা

পুণ্য সাহিত্যের অভাব ছিল না। ১৯২১-এর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তখনকার 'যমুনা' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে অনেক অখ্যাত ছোটগল্প লেখা হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'রাজপথ' বোধকরি এই সময়েরই লেখা। কিন্তু এর পর ১৯৩০-এর আরও বড় আন্দোলন কোনো ছাপই রাখতে পারেনি সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। সেই সময়কার বই পড়ে মনে হবে যেন কিছুই হয়নি। তার কারণ তখনকার বুর্জোয়া রাজনীতি আর সম্প্রসারণশীল নয়। তা গতানুগতিকতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সাহিত্যে স্থান লাভ করার মত জীবন তার আর ছিল না। অবশ্য দোষটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর চাপিয়ে বসে থাকাও ভুল। এই অধঃপতনের দায়িত্ব সাহিত্যিকদেরও বইতে হবে বই কি! তাঁদের উন্নতর রাজনৈতিক চেতনা না আসার কোনো কারণই তো ছিল না।

এইভাবে আমাদের সমাজের বৃহত্তম সংগ্রামকে উপেক্ষা করে অতি-আধুনিকরা মানুষের 'মন' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বড় গলায় জাহির করলেন 'প্রচারের' সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই; তাঁদের সাহিত্যটা হল 'নির্ভেজাল সাহিত্য'। তা সত্ত্বেও, আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর এত দুর্বলতা সত্ত্বেও,তার সামনে এতসব প্রগতি-সংগ্রামের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল যাকে পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করা অতি আধুনিকদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। যখন অতি-আধুনিকরা ভেবেছেন তাঁরা ভুলেও সাহিত্যকে 'প্রচার যন্ত্র' করে তুলবেন না, তখন নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থানে-অস্থানে বড় বড় ইশ্‌তেহার বসিয়ে গেছেন। কিন্তু এই সামন্ত-নীতি-বিরোধী অভিযান অতি-আধুনিকদের কাছে অতি উগ্র রূপ ধারণ করলেও তা কোনোক্রমেই সক্রিয় প্রভাব বিস্তারক্ষম ছিল না। তার কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে পরাজয়ের মনোবৃত্তি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে জন-গণ-মন হরণ করতে পারে এমন দৃঢ় সুযুক্তিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী উপায়ে সামন্ত-নীতি-বিরোধী বিষয়বস্তুকে তাঁরা গল্পে বা উপন্যাসে চিত্রিত করতে পারেননি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে সমাজকে সংশোধন করতে তাঁরা পারেন না। দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যই তাঁরা অত্যন্ত আক্রমণশীল হয়ে উঠে সামন্ততন্ত্র-প্রভাবাধীন জনসাধারণকে উত্তেজিত করে দিয়ে প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। যে মনস্তত্ত্বের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনীতি-ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর আস্থা হারিয়ে সন্তায় বাজীমাৎ করতে গিয়ে আপোস বা সন্ত্রাস-বাদের পথে চলে গেছে, সেই মনস্তত্ত্বের ফলেই বুর্জোয়া সাহিত্যিকগণ জনসাধারণের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে চেষ্টা না করে তাদের সেন্টিমেন্টের উপর আঘাত করেছেন। ফল যে ভাল নয় তা তাঁরা নিজেরাও জানতেন; তাঁদের নায়করা কেউই সার্থককর্মা নয়; এমন কি তাদের ব্যর্থতার মধ্যেও টুর্গেনিভের নায়কদের মত বিরাটত্ব নেই; তাদের ব্যর্থতা হল দু'চারদিন জোনাকীর মত জ্বলে হঠাৎ নিভে জনারণ্যে একেবারে মুছে যাওয়ায়। অতি-আধুনিকরা কাজেই ট্র্যাজেডি লেখেননি, লিখেছেন সিনিক বা জীবনের উপর বিতৃষ্ণ লোকদের মনের কাহিনী।

ইতিপূর্বে বলেছি অতি-আধুনিকদের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় অল্প বয়সে। তাঁদের সাহিত্যের এবং সাহিত্যিক জীবনের কোনো দীর্ঘ ভবিষ্যৎ আছে বলে তারা নিজেরাও মনে করতেন না। তার প্রমাণ মেলে এইখানটায় যে, ভাষা এবং টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে এবং মতামতের ধারে তাঁরা চেয়েছিলেন পাঠকদের ধাঁধিয়ে দিতে। মাত্র দশ-বারো বছর পরে হয় তারা সাহিত্য লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন আর না হয় তাঁরা রচনারীতির পরিবর্তন করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও আর কোনো যুগই এত ক্ষণপ্রভ হয়নি।

অচ্যুত গোস্বামী

রক্তের ডাক

পেটের ডানদিকটায় সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথাটা এক একবার বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিকিয়ে উঠছে। এ্যাল্‌কোহলিক সিরোসিস্।

এই সেদিন পর্যন্ত কী গর্বটাই না করে বেড়াতো কোরবান। বুক ফুলিয়ে বলতো: আগর্ সরাবই না খেলাম ডাগ্‌দর বাবু, তবে আর মরদ কিসের? বিমারি-টিমারি, ও আমার হবে না—আপনি বেফিকির থাকেন।—বলেই চোখের ইসারায় বাজুর তাবিজটা দেখিয়ে পান-খাওয়া কুচকচে দাঁতগুলো উদ্ঘাটিত করে দিয়ে কোরবান হাসতো: হাঁ;—মাথা দুলিয়ে তাবিজের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতো: দেখেছেন এটা কী? চালাকি নয় বাবু, জবরদস্ত্ ফকিরের দেয়া তাবিজ—সালা রোগের সাধ্যি কি কাছে ঘেঁষে। ফিম্ আমার ডর্ কী বলুন?

কিন্তু তার সেই গর্ব, তাবিজের সেই মাহাত্ম্য ধূলিতে মিশে গিয়েছে। নিরঙ্কুশ সরাবের নেশা ক্ষমা করেনি কোরবানকে। অত্যাধিক পানদোষের বিষক্রিয়া অবশেষে দেখা দিয়েছে। কিছুদিন হোলো প্রকাশ পেয়েছে জীর্ণ লিভারের অসহ্য কঠিন এই ব্যাধি।

অহর্দিন হলে দাঁতে ঠোঁট চেপে যন্ত্রণা-বিকৃত আনত মুখে বেঞ্চের একপ্রান্তে বসে থাকতো কোরবান শেখ। মনে মনে ধিক্কার দিত নিজেকে। ব্যাধিগ্রস্ত লিভারের কোষে কোষে দুঃসহ ব্যথাটা থেকে থেকে যখন চিন্‌চিনিয়ে উঠতো তখন নিজের বর্বর পান-প্রবৃত্তির প্রতি একটা নিষ্ফল আক্রোশ অনুভব করে অস্বাভাবিক রকমের অধীর হয়ে উঠতো কোরবান। আর সেই মুহূর্তে মহল্লার ভাঁটিখানার সেই মেদপুষ্ট ভুঁড়িওয়ালা শুঁড়ীটার প্রকাণ্ড মুখখানা ভেসে উঠতো তার চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরটা প্রতিহিংসার আঁচে যেন ঝল্‌সে যেতো—তখন ইচ্ছে করতো ছুটে গিয়ে ছোরার আঘাতে সেই হারেমীটার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে আসে—খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেঁসে দিয়ে আসে তার চর্বিওলা ভুঁড়িটাই—ডেকে ডেকে ধারে খাওয়ানোর শয়তানি বুদ্ধিটাকে খতম করে দিয়ে আসে চিরদিনের মতো।

কিন্তু কোরবান শেখ আজ বে-খেয়াল। এই মুহূর্তে তার বাহ্যিক চেতনাটাই বুঝি লোপ পেয়ে গিয়েছে। দুঃসহ রোগের এমন অব্যক্ত জ্বালার অনুভূতিটাও যেন তেমন আর অনুভব করছে না। মুখের পেশীতে কোনোখানে এতটুকু কুঞ্চন পড়ছে না কোরবানের। অহর্দিনের মতো অসহনীয় জ্বালায় যন্ত্রণা-বিকৃত চাপা কণ্ঠে একবারো গোঙাচ্ছে না: আয় বাপ্!—জিন্দেগি বরবাদ হয়ে গেল বলে আফশোস বশে ভুলেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অবধি ফেলছে না। ডাক্তার বসুর ক্লিনিকের এক কোণে বর্ষণ-উন্মুখ আকাশের মতো গম্ভীর মুখে বসেছিল কোরবান।

আজ প্রায় সারাটা দিন ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে কাটা ছাগলের মতো কোরবান ছট্‌ফট্ করেছে—এক একবার কুঁকড়ে গিয়েছে অসহ্য যন্ত্রণায়। সন্ধ্যার দিকে,

এই ঘন্টাখানেক আগে সুঁই নেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন ডাক্তার বসুর ক্লিনিকে আসছিল কোরবান তখন পথেই সে প্রথম শুনতে পেয়েছে: আবার গুলি চলছে ধরম্‌তলায়—পিচঢালা কালো রাস্তায় খুনের দরিয়া বইছে। তবে আজ শুধু হিন্দুরাই নয় একা—জালিমের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ভাইরাও।

খবরটা শোনা অবধি অপরিসীম অধীরতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে কোরবান: হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গেল!—এক হয়ে গেল সব ঝাণ্ডা! বলে কী! তা হলে তো এইবার জালিমের সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে—আদায় করা যাবে রশিদআলীদের মুক্তি—বারতানিয়ার দম্ভ চুরমার করা যাবে অনায়াসে। হিন্দু-মুসলমানের একতা! ইত্তিফাক্! আর চাই কি—কিসের জন্য আর অপেক্ষা? জুলুমের সীমা তো কখন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এইবার বজ্রনিনাদে ফেটে পড়ুক কোটি জনতার পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ—চুরমার করে দিক সব, তচ্‌নচ্ করে দিক···

গত নভেম্বরের হাঙ্গামায় কোলকাতার পথে পথে যখন সাম্রাজ্যবাদী ঘাতকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল জনতা তখন কোরবানের রক্তেও কল্লোল জেগেছিল—এক একবার ইচ্ছে করেছিল বোমার মত সেও ফেটে পড়বে—মানবে না কোনো কওমি বাধা-নিষেধ। কিন্তু এবারের হাঙ্গামার খবরটা শুনেই তার মাথায় রীতিমতো খুন চেপে গিয়েছিল; ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডল চাইছিল ছিঁড়ে পড়তে: হাঁ, আব্ ওক্‌ৎ আয়া—ওক্‌ৎ আয়া খুন কা বদলা খুন লেনে কা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ ভাইরা জান দিচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ-শাহীর নির্বিচার গুলির মুখে। ভেবেছে কী তারা—ওই সব জালিমের বাচ্চা—নাফর্‌মান মর্‌দুৎ? গুলি চালিয়ে আমাদের সম্মিলিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠের সোর মচানা স্তব্ধ করে দেবে? হরগেজ্ নেহি।...

শিথায়িত বিদ্বেষের জ্বালায় তার ব্যাধি-জর্জর লিভারের অসহনীয় এই জ্বালা-বোধ কখন যে তলিয়ে গিয়েছিল তা জানতেই পারেনি কোরবান। ডাক্তারখানায় আসবার পথে শোনা কাল্লুর অধীর কণ্ঠের কথাগুলো থেকে থেকে তার কানে বাজছিল: শোনা, শোনা ওস্তাদ, শোনা আজ কা খবর?··· মনে পড়ছিল মিঠাইয়ের দোকান থেকে রাম মিশিরের ডাক: কাঁহা চলতে হো কোরবান ভাইয়া? আও, আন্দর আও। আজ হাম আওর তোম তো মিল গিয়া, শোনা ভি তো?

কোরবান শেখ রাজাবাজার মহল্লার নামকরা গুণ্ডা। টেগার্টের আমলেও পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে করতো না এমন দুষ্কর্ম ছিল না। নারকেল ডাঙ্গার বস্তিতে একবার বছর দশেক আগে জেনানা সম্পর্কিত এক হাঙ্গামায় প্রতিপক্ষের কে একজন অসতর্ক মুহূর্তে তার শিরদাঁড়া ঘেঁষে লম্বা একখানা ছোরা চালিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার বসুর সযত্ন চিকিৎসায় বেঁচে উঠলেও এখনো বিদ্ধ স্থানটিতে কোথায় যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই খচ্‌খচে একটা ব্যথা অনুভব করে। তার ওপর বয়সও বাড়ছে কোরবানের। স্বভাবতই তার উন্মত্ত হিংস্রতা দিন দিন ভোঁতা হয়ে আসছিল। আগে কারণে-অকারণে তুবড়ীর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠতো কোরবান—তার ইস্পাত-কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হাতে হত্যার উল্লাসে আচমকা ঝিকিয়ে উঠতো শানিত তীক্ষ্ণ ছোরা। ঝাঁপায় ঝাঁপায় তাড়ি খেয়েও এতটুকু নেশা হোতো না। এখন অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছে—অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে তার আদিম বন্যতা। কিন্তু তবু আজকের

এই মুহূর্তে কোথা থেকে যেন কী হয়ে গিয়েছিল—কোরবানের অন্তর্লীন ঝিমিয়ে আসা হিংস্রতা একটা চকিত আলোড়নে আগ্নেয়গিরির মতোই যেন বিক্ষুব্ধ গর্জনে চাইছিলো ফেটে পড়তে।

ডাক্তার বসুর ক্লিনিকে রোগীর ভিড়। দু' একজন করে লোক আসছে আর যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু পর পর একধার থেকে রোগী দেখে যাচ্ছেন। প্রতীক্ষমান কয়েকজন লোকের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা চলছে। তাঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কী একটা মন্তব্য কানে যেতেই কোরবানের চট্‌কা ভেঙ্গে গেল। মুখ ঘুরিয়ে সে তাকালো। চোখদুটো তার আরক্তিম হয়ে উঠেছে। ঝাঁজালো স্বরে সে বললে : আপ্ কী বোললেন বাবু ?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ফিরে তাকালেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কোরবানের সর্বাঙ্গে চোখটা বুলিয়ে নিলেন একবার। লুঙ্গি-পরা এই ইতর লোকটার সঙ্গে কে কথা বলতে যাবে ? বিজাতীয় ঘৃণাই অনুভব করলেন ভদ্রলোক। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্য সংক্ষেপে বললেন : কিছু না।

—কেয়া, কিছু না ?—আগের চাইতেও ঝাঁজালো স্বরে কোরবান আবার প্রশ্ন করলে।

ভদ্রলোকটি এবার কিন্তু একটু যেন হক্‌চকিয়ে গেলেন। কোরবানের কণ্ঠস্বরে উষ্মা অনুভব করেছেন তিনি। লোকটার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ফলটা খুব প্রীতিকর নাও হতে পারে। ছোটলোকদের বিশ্বাস নেই। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই বললেন, কী আবার বলবো—বলছিলাম, এসব হাঙ্গামা করে কী লাভ ? গতবারের মতো গুলিতে সব তো আবার ঠাণ্ডা করে দেবে।

—ঠাণ্ডা করে দেবে !— কোরবান হিংস্রভাবে খিঁচিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে চোখদুটো তার জ্বলে উঠলো ধ্বক্ ধ্বক্ করে : কিসকো কৌন্ ঠাণ্ডা করেগা ? আপ জানতে হ্যাঁয়, ইস দফা একেলা হিন্দুলোগ নেহি—মুসলমান ভি আ মিলা—আব্ তুফান বহে গা তুফান, সমঝে বাবু ?

ওপাশের বেঞ্চি থেকে একজন তরুণ বয়স্ক লোক সোৎসাহে কোরবানকে সমর্থন করলে ; ঠিক ভাই, বিলকুল ঠিক। এ্যাদ্দিন তো শুধু একতারই অভাব ছিল। এবার তোমরাও যখন এসে মিলেছ তখন তো তুফান বইবেই। কোনো শালাকে আর ঠাণ্ডা বানাতে হবে না আমাদের—বেনের জাত এবার পালাতে পথ পেলে হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কিন্তু দমলেন না। বরং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। হুঁ, তুফান বইবে। আরে বাবা গুটিকয়েক মিলিটারী ট্রাক পোড়ালে আর ধরে ধরে জন কয়েক গোরাকে 'জয় হিন্দ' বলালেই কী আর স্বাধীনতা আসে ? দেখছি তো উল্টে সব নিজেদেরই নিরীহ লোকেরা গুলি খেয়ে মরছে। কী লাভ বাবা এতে ?—মুখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোক পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন, ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, আমাদের দেশের লোকের কথা আর বলবেন না মশায় ! একটা হুজুগ পেয়েছে কি, ব্যাস, অমনি হৈ চৈ। গতবারের কাণ্ডখানা দেখলেন না,—যত সব অশান্তি বাধানো আর কি।

একেই তো উন্মত্ত ক্রোধে কোরবানের রক্ত বগ্ করে ফুটছিল ; তার ওপর ভদ্রলোকটির বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। আগুনে যেন ঘি পড়লো। দপ্ করে জ্বলে ওঠার মতোই কোরবান আচমকা খাড়া হয়ে দাঁড়ালো : গরদার কাঁহাকা !—পর মুহূর্তে প্রৌঢ়

ভদ্রলোকটির ওপর সিংহের মতোই কোরবান ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য ! তেমন কিছুই সে করলো না। মুহূর্তখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরালো : আব্ মুজ্‌হে সুঁই দে দিজিয়ে ডাগদর বাবু—হাম যায়েঙ্গে।

ডাক্তার বসু ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। আজ দশ বছর থেকে কোরবানকে চেনেন তিনি। শুধু চেনেন বললে অবশ্য ভুলই হবে—কোরবানের নাড়ি-নক্ষত্রের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠ। বর্বর হলেও কোরবানের এমন একটা দিক আছে যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বহুদিন আগেই। এতটুকু উপকার যার কাছ থেকে সে পেয়েছে তার জন্য কোরবান হাসিমুখে নিজের জানটাই কোরবানী দিয়ে বসতে পারে। এ খবরটা ডাক্তার বসুর জানা ছিল বলেই কোনোদিনও এই লুঙ্গিপরা লোকটাকে তিনি ইতর ভাবতে পারেননি। তিনি হেসে বললেন, রাগ করো না, বসো—খালি সুঁই নিলে তো চলবে না—দাওয়াই নেবে কে ?

—ছোড়িয়ে দাওয়াই-ওয়াই ; শালা সুঁই ভি নেহি লেঙ্গে। —অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে কোরবান বেরিয়ে যেতে পা বাড়ালো।

—আরে, চলেছ কোথায় ? বসো, বসো।

এবার আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো কোরবান। চোখদুটো তার রক্তমুখী হয়েই আছে। সে বললে, আপ্‌কা বদনামী হোগা ইস্ লিয়ে, নেহি তো ইয়ে বাবুকো আজ এক আচ্ছা সবক দেতা হাম !—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির দিকে এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই কোরবান দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—দেখলেন, দেখলেন তো ছোট লোকটার সাহস !—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

তরুণ বয়স্ক লোকটি বললো : ওসব ছোটলোক ভদ্রলোক বুঝিনে মশাই। দোষ ওর নয়—দোষ তো আপনার নিজের। আজ যে মুসলমানরাও এসে যোগ দিয়েছে এটা দেশের পক্ষে মস্ত একটা আশার কথা—কোথায় উৎসাহ দেবেন তা নয়, যাচ্ছেতাই কী সব বলে লোকটাকে অনর্থক ক্ষেপিয়ে দিলেন। আপনাদের মশাই কোনো দিনও শিক্ষা হবে না।

—অর্থাৎ ?—ব্যঙ্গকুটিল চোখে তাকালেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি : তা সে যেই হোক না কেন, হুলিগ্যানইজম্ করে দেশের সর্বনাশটা করবে আর আমরা চুপ করে থাকব ! এ-ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কোনো মানে হয়, না কংগ্রেস এসব সমর্থন করে ? যারা মূর্খ—ছোটলোক, তাদের এ-বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়াই তো উচিত। আমি অন্যায় বলিনি কিছু, বুঝেছেন ?

—ঠিকই তো—পাশের ভদ্রলোক সায় দিলেন : কোনোরকম গুণ্ডামীকেই প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। তাতে দেশের—

কথাটা শেষ হবার আগেই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে একটা ধমক দিয়ে বসলেন ডাক্তার বসু : আপনারা দয়া করে এবার থামবেন কি ?—কেন কে জানে ডাক্তার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। টেবিলের ওপর থেকে স্টেথিস্‌কোপটা তুলে নিতে নিতে অত্যন্ত বিরস কণ্ঠেই বললেন : এটা ক্লাব রুম নয়, আমার চেম্বার।

ওদিকে তখন সর্বাঙ্গময় অগ্নিনিস্রাবের দুঃসহ দহন জ্বালার অনুভূতি নিয়ে কোরবান হন হন করে এগিয়ে চলেছিল।

রাজাবাজারের মোড়টার কাছাকাছি একটা বিড়ির দোকানের সামনে এসে হঠাৎ সে থেমে দাঁড়ালো। সারা মুখখানা তার চক্ চক্ করছে—জল্ জলে আগ্নেয় চোখ দুটো স্ফীত হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে দোকানের সম্মুখে ফুটপাথে পাতা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়লো কোরবান।

সারকুলার রোডে ট্রাম চলাচল বন্ধ। ক্বচিৎ কখনো দু'একখানা বাস যাতায়াত করছে। হঠাৎ কী একটা স্মরণে আসতেই কোরবান ফিরে তাকালো: তাদের বিড়ির দোকানের পাশের হোটেলটা খোলাই তো রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনকার মতো আজ সেখানে হুল্লোড় কই? গ্রামোফোনে কোকিল-কণ্ঠীদের গান? কোথায় আজ অবিশ্রান্তভাবে বেজে চলা নানা রেকর্ডের কাওয়ালী আর নাত্। বিস্ময়করভাবেই নীরব হয়ে আছে হোটেলটা—কিসের এক যাদুমন্ত্রে ভেতরটায় গম্ভীর থম্থমে আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছে যেন। অথচ কী আশ্চর্য, হাওয়াই-হামলার দিনগুলোতে যখন গভীর আতঙ্কে মৃত্যু-মগ্ন হয়ে উঠতো সারা কোলকাতা তখনকার সেইসব উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চিত দিনেও এই হোটেলটা সর্বক্ষণ সরগরম থাকতো। গ্রামোফোন বেজেই চলতো একটানা—আর সমস্ত কিছুর সোরগোল ছাপিয়ে শোনা যেতো হোটেলের বয় মোস্তাফার উত্তাল কণ্ঠের ঘন ঘন হাঁক। আর আজ.....

হাঁ, আব্ তক্ জিন্দা হায় মুসলমান!—কোরবান সেখের বুকখানা গর্বের আনন্দে চকিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে: হামারা খুন লাল হায় আব্ তক্। কে বলে মুসলমানেরা বে-খেয়াল, নিষ্ক্রিয়-অলস? কে বলে জালিমকে তারা চিনতে পারেনি? সব ঝুট্। দেখুক, দেখুক না চেয়ে সেইসব কুৎসাকারীর দল। দেখুক আজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারাও জলন্ত বিদ্বেষে রুখে দাঁড়াতে পারে কিনা—তাদেরও ঘরছাড়া করে কিনা রক্তের ডাক।

বিড়ির দোকান থেকে নেমে কোরবানের পাশে এসে দাঁড়ালো কাল্লু। একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরলে, লো ওস্তাদ।

কোরবান কিন্তু বসেই রইল তেমনি আচ্ছন্নভাবে। চোখের পলক পড়লো না পর্যন্ত—যেন কথাটাই শুনতে পায়নি সে।

সবিস্ময়ে কোরবানের মুখের দিকে অপাঙ্গে তাকালো কাল্লু। যা ভেবেছে তাই। হুঁস হারিয়ে ফেলেছে ওস্তাদ। চোখের দৃষ্টি তার স্থির আর নিষ্পলক। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ঝলক দিয়ে উঠে থমকে রয়েছে মুখখানায়—যে কোনো মুহূর্তেই তোড়ে ফিন্‌কি দিয়ে ফেটে বেরুতে পারে। অপ্রকৃতিস্থ কোরবান। বিচিত্র কিছু নয়। কাল্লুর নিজের দিলটাই আজ যে ভাবে 'বেচাইন' হয়ে উঠেছে তাতে করে তার ওস্তাদের মতো লোকের পক্ষে খুন-খারাবির জলন্ত নেশায় নিজের চেতনাটা হারিয়ে বসাই স্বাভাবিক। কিন্তু..... ?—কাল্লুর চোখের দৃষ্টি কেন কী জানি অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো: কিন্তু তাই বলে এতখানি বেহুস-বেতাব, এমন চৈতন্য-বিলুপ্তি! একি ভীষণ মূর্তি ওস্তাদের!—কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো কাল্লুর।

স্পন্দিত বুকে কাল্লু নিজের প্রসারিত হাতখানা গুটিয়ে নিলে। তারপর চিন্তাগ্রস্তভাবে বিড়িটা নিজেই ধরিয়ে নিয়ে কোরবানের পাশে বসে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল কে জানে। হঠাৎ এক সময়ে কোরবান কী দেখে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালো। কাল্লুরও চোখে পড়েছে: ছুটো সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই ট্রাক সাঁ সাঁ দক্ষিণমুখী চলে যাচ্ছে নক্ষত্রবেগে। ধরমতলার উদ্দেশ্যেই নয় তো?

—কাল্লু! গম্ভীর চাপা কণ্ঠে কোরবান ডাকলো: কাল্লু! এবং পরক্ষণেই সে মোড়ের দিকে এগিয়ে চললো সঙ্কল্প মন্থর পায়ে।

* * * *

ঘুমটা যখন বেশ গাঢ় হয়ে আসছে ঠিক সেই সময় নিচের সদর দরজায় ঘন ঘন কড়া নড়ে উঠলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। অপরিসীম বিরক্তিতে উঠে বসে বেড্ সুইচটা অন্ করে দিলেন ডাক্তার বসু। আপদ আর কি! রাত ছুপুরেও দেখছি রেহাই দেবে না লোকেরা। নাঃ, এতটা পসার না হলেই যেন ভাল হোতো। অন্তত রাতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনো যেতো নিরুপদ্রবে।

—ডাগদর বাবু! ও ডাগদর বা-বু!

—কে? কোরবানের গলা না? জিজ্ঞাসু চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার বসু।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার সেই পেয়ারের লোকটাই। এই রাত ছুপুরে যত সব মাতালের কাণ্ড! জ্বালাতন আর কি। তোমার কিন্তু নিচে গিয়ে কাজ নেই বাপু; ওপর থেকেই ডেকে বলে দাও দরকার থাকলে কাল যেন আসে। রাত-বিরেতে ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে—ছিঃ ছিঃ—

—কিন্তু সে তো আজকাল মদ খায় না—আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছে।

আহা কী আমার ভীষ্মদেব রে! ওদের আবার প্রতিজ্ঞা। শুনলে না গলার স্বরটা কেমন জড়ানো? মদ আবার খায় না! না, না, তোমার নিচে যেতে হবে না। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে মাতালদের, বুঝেছ?

—ভয় কিসের? নিশ্চয়ই কোনো দরকারে এসেছে, নইলে এত রাত্তিরে ও আমায় কখ্খনো বিরক্ত করতো না।—ডাক্তার বসু পায়ে স্লিপার জোড়া ঢুকিয়ে দিলেন।

—তবু তোমার যাওয়া চাই, না? আমার কথাটা বুঝি গ্রাহ্য হোলো না। ঢের দেখালে যা হোক। বিনে পয়সায় তো চিকিৎসা করছেই তার ওপর যখন তখন ওই ম্লেচ্ছো ছোটলোকটার সঙ্গে মাখামাখি না করলে তোমার চলবে কেন! নিজের এতটুকু মর্যাদাজ্ঞান বলেও কী কোনো পদার্থ থাকতে নেই তোমার? যত সব হুঁ।—সর্বাঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার বসুর স্ত্রী পাশ ফিরে শুলেন।

শুধু অহেতুক ভীতিই নয়, স্ত্রীর কণ্ঠে কোরবানের প্রতি একটা সংস্কারগত অবচেতন বিদ্বেষও যেন অনুভব করলেন ডাক্তার বসু। কৌতুক বোধ হোলো তাঁর। মেয়ে-জাতটা সত্যি কী অদ্ভুত! এই সেদিন পার্কে খুকীর গলা থেকে হারটা কে একজন বেমালুম সরিয়ে ফেললে। শুনেই ক্রুদ্ধ হয়ে কে বলেছিল: মেরা নাম শেখ কোরবান। ইয়ে মহল্লামে কৌন্ শালা এত্না ভারী বাহাদুর হ্যায় মো আপকা চিজ্ হজম কর্ লেগা? আম্মাজিকো বেফিকির

রহ্‌নে বোলিয়ে ডাগ্‌দর বাবু।—সেদিন কে এনে দিয়েছিল খুকীর হার? কিন্তু তবু সে ছোটলোক—আশ্চর্য!

ডাক্তার বসু চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এলেন। সদর দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে চাকরটা। কাল্লু কাঁধে ভর দিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোরবান।

—কী ব্যাপার হে, এত রাতে?

—ওস্তাদের বদন থোরা জ্বলে গেছে ডাগদর বাবু।—একটু ইতস্তত করে কাল্লু বললে।

—আমি তখনই বুঝেছিলাম কাণ্ড একখানা বাধিয়ে আসবে।—ডাক্তার বসু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: দেখি, দেখি, ভেতরে এসো।

অপারেসন্ টেবিলের ওপর কোরবানকে শুইয়ে স্লাইডিং বাতিটা খানিকটা নিচে টেনে নামালেন ডাক্তার বসু। তাঁর পরীক্ষা-রত চোখের দৃষ্টি দেখতে দেখতে চঞ্চল হয়ে উঠলো—ভ্রূদুটো গেল কুঁচকে। মারাত্মক বার্ণ্ট কেস। দেহের সম্মুখভাগ ভীষণভাবে ঝলসে গেছে, পরম উৎসাহে মুখথানাও লেহন করে গেছে আগুনের শিখা। প্রায় সারা বুকটা জুড়েই পেশীগভীর ক্ষতচিহ্ন দগ্ দগ্ করছে—হাতদুটোতে বীভৎস সব ফোস্‌কা। কোথাও গায়ের চামড়া গুটিয়ে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে লাল্‌চে নগ্ন মাংস। ঝলসে যাওয়া কালো মুখথানা বিবর্ণ হয়ে আছে। ভ্রূদুটো রোমহীন—খাপছাড়াভাবে মাথার চুলও পুড়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে অব্যক্ত যন্ত্রণার মসীহীন রেখাঙ্কন।

ক্ষিপ্র অথচ সংযত হাতে কোরবানের পোড়া সার্টটার অবশিষ্ট টুকরোগুলো ছিঁড়ে ফেললেন ডাক্তার বসু। থার্ড ডিগ্রী বার্ণ্ট কেস। প্রচণ্ড শক্; তার ওপর সেপসিসের আশঙ্কা।—মনে মনে তিনি শংকিতই হয়ে উঠলেন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে একটা মরফিয়া ইঞ্জেক্‌সন্ দিয়েই তিনি 'ট্রিপ্যাল ডাই'-এর ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। প্রশ্ন করলেন: এমনভাবে কী করে পুড়লো শুনি?

অপারেসন্ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে কোরবানের দগ্ধ দেহটার দিকে তাকিয়েছিল কাল্লু। উগ্র বিজলী বাতির উদ্ভাসিত আলোকে সে যেন এতক্ষণে দেখে বুঝতে পেরেছে কী ভীষণ মারাত্মক রকমের অঘটন ঘটে গেছে একটা। উত্তরে কান্নার মতো স্বর বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে: পেঠ্‌রোল কা আগ্‌সে বাবু। যেয়সাহি টান্সি বাষ্ট হুয়া বাস্ ওয়েসাহি সারা বদনমে শালা আগ্ যেয়সা কুদ্ পড়া।

—ট্রাক জ্বালাতে যাওয়া হয়েছিল! বলিহারি তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান। এখন যাও বেশ করে আবার আগ লাগাও গে? যেমন কর্ম তেমনি ফল—ঠিক হয়েছে।—ডাক্তার বসু গম্ভীর মুখে স্প্রের বোতলে ট্রিপ্যাল ডাই ঢালতে লাগলেন।

আর ধীরে ধীরে মুদিত চোখের রোমহীন পাতাদুটো খুলে পিট্ পিট্ করে তাকালো কোরবান শেখ। ততক্ষণে ডাক্তার বসু স্প্রে হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোরবান এবার অপলক দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর দিকে। চোখের সে-কী অদ্ভুত চাহনি—ঠিক যেন ডাক্তার বসুর দিকে চেয়ে নেই; তাঁর দেহ ভেদ করে কোথায় যেন চলে গেছে সে-দৃষ্টি। অকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বললে, কেয়া স্রেফ তিন মিলিটারী ট্রাক জ্বালাকে মরঙ্গে হাম, বস্? তব মেরা কসম্ কৌন্ পুরা করেগা? থোরা বদন জল্ গিয়া তো

কেয়া পর্‌ওয়া।—নিষ্পলক চোখদুটো কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে এলো কোরবানের। আর সেই সঙ্গে দোদুল্যমাণ উগ্র বিজলী বাতিটার চেয়েও সহস্রগুণে প্রখর হয়ে জ্বলতে লাগলো তার চোখের দুটি তারা: জঙ্গ তো স্রেফ শুরু হুয়া ডাগ্‌দর বাবু। ইসকা আথের তো দেখ্‌নে দিজিয়ে—কসম্ কম মেরি দিল্‌কি আগ তো বুতানে দিজিয়ে। উসকা বাদ মওৎ আয়ে তো সহি—লেয়কেন আব্ তো শালা খুদ্ আজ্‌রাইল ভি হাম্‌সে দূর রহেগা ডাগদর বাবু।

একটা চমক লাগলো ডাক্তার বসুর: একি সব বলছে মুমূর্ষু লোকটা! দশ বছর আগেকার এই কী সেই মৃত্যুভয়জর্জর ছোরাবিদ্ধ কোরবান শেখ? এ কী অভিনব মহতী রূপ! এত দিন তার অন্তরের এই আগ্নেয় জ্বালা কোথায় ছিল লুকানো?—মুগ্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণের জন্য ডাক্তার বসু ভুলে গেলেন, তাঁর সামনে রয়েছে প্রতীক্ষমাণ এক মারাত্মক এ্যাক্সিডেন্টের রোগী—ভুলে গেলেন, তিনি ডাক্তার।

* * * * *

সমস্ত কাজ ফেলে সকালের দিকে এসে ডাক্তার বসু কোরবানকে ড্রেস্ করে গিয়েছেন। অবস্থা তার উদ্বেগজনক। শক্‌টা কাটিয়ে উঠলেও দগ্ধ শরীরের কোষে কোষে সেপ্‌সিপের বিষক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কাটা এখনো রয়েছে। চিকিৎসার সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বটে তবু ডাক্তার বসু আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আজো একবার তিনি চেষ্টা করে গেছেন কোরবানকে রাজী করাতে। কিন্তু সে কিছুতেই টলেনি। বলেছে, নেহি নেহি, হাম কভি নেহি যায়েঙ্গে হাসপাতাল। উঁহা থোরাই আপ্‌কা তরেহ্ মেরা এলাজ করেগা কোয়ি।

গরীবের ঘরে যতটা থাকা সম্ভব ততটুকু পরিষ্কার একটা কাঁথার ওপর কোরবান শুয়েছিল। শরীরের সমস্ত পেশীগুলো যেন তার কুঁচকে গেছে অসাড় হয়ে। আর চেতনা? সেটাও দুঃসহ প্রদাহের চমকে চমকে মধ্যে মধ্যে লোপই পেয়ে বসে। নিরবচ্ছিন্ন অব্যক্ত জ্বলুনি আর সর্বাঙ্গময় দুঃসহ দপ্‌দপে ব্যাথা—মাথার শিরা-স্নায়ুগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়তে চায়। সময় বুঝে লিভারের ব্যাথাটাও আজ চিন্‌চিনেয়ে উঠেছে ভীষণ ভাবে—যেন অদৃশ্য হাতে অনবরত তীক্ষ্ণাগ্র সুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে কেউ। এক একবার ভাষাহীন যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠে কোরবান ঘন ঘন মাথাটাকে এলোপাথারি ঝাঁকাচ্ছে। আর শিয়রে এক ঠাঁয়ে বসে আশঙ্কা-বিধুর দুরু দুরু বুকে পাখা করে চলেছে কোরবানের বৌ।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা সোর ভেসে এলো। প্রথমে কিছুই মনে হয়নি কোরবানের। কিন্তু সেই দূরাগত হাল্কা ছাপিয়ে কিসের ঘন ঘন আওয়াজ তার মুখথানারই ওপর যেন সাঁই সাঁই চাবুক মেরে গেল। ভীষণভাবে চমকে উঠে সে চোখ দুটো মেলে তাকালো—যন্ত্রণার আচ্ছন্নভাব কেটে গেল মুহূর্তে: গোলি! হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ খেয়েই যেন আচমকা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কোরবান শেখ।

বে-সামাল ত্রস্ত পায়ে ছুটে বেরুতে যাবে এমন সময় ব্যাকুলভাবে পথ আগলে দাঁড়ালো তার বৌ: নেহি, নেহি মৎ যাও কাঁহি—মৎ যাও!

—ছোড়, ছোড়।—অধীর উত্তেজনায় বৌকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে কোরবান দমকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজাবাজার ও'র সারকুলার রোডের মোড়। ছদিকে যতদূর চোখ যায় টুকরো টুকরো বিক্ষুব্ধ জনতা—ঘরছাড়া বিপ্লবী সৈনিকের দল। মৃত্যুভয়হীন। বজ্রকঠোর মুখে মরণ-পণের আগ্নেয়-লেখা— জাতির সমস্ত অপমান আজ তারা ঘুচিয়ে দেবেই।

একটু আগে এখানে গুলি চলেছে। রক্তস্নাত রাস্তায় ও'র ফুটপাথে ঝরে-যাওয়া রক্তপদ্মের মতো মৃত-আহতদের দল। একটা ট্রাক তখনো জ্বলছে দাউ দাউ করে। কিন্তু শত রৌরব, শত হাবিয়ার আগুন নিয়ে জ্বলে উঠলো কোরবানের চোখ।

তেরঙ্গা পতাকা হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো কাল্লু। রাম মিশির এলো সবুজ নেশান কাঁধে। লাল ঝাণ্ডা উঁচিয়ে উদ্বেলিত বুকে দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো অযোধ্যা সিং। আরো এলো অনেকেই—মহল্লার ঘরছাড়া কত হিন্দু-মুসলমান। উল্লসিত ধ্বনি উঠলো কণ্ঠে কণ্ঠে :

—আয়া কোরবান ভাইয়া, আয়া তুম্!

—আব্ তো কামাল করেঙ্গে হাম লোগ।

—আখের তুম ভি আ গিয়া ওস্তাদ!

নবতর উদ্দীপনার যেন গুঞ্জন পড়ে গেল দিকে দিকে।

আর পরক্ষণেই মন্থর-দাম্ভিক চালে কোথা থেকে আবার এসে দেখা দিলে একটা সাঁজোয়া গাড়ি। ফুটপাথ থেকে উত্তাল ধ্বনি উঠলো কচি কচি কণ্ঠে : জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! —থান থান ইঁট মারমুখী হয়ে উঠেছে বাচ্চা সৈনিকদের উদ্যত হাতে।

গাড়িটা হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। সাঁ করে ঘুরে এলো ছেলেদের ছোট্ট দলটির কাছ বরাবর। 'পালিয়ে যা', 'ভাগ্ যা'—সোর উঠেছিল বয়স্কদের কণ্ঠে। কিন্তু একপাও কেউ নড়েনি।

সাঁজোয়া গাড়িটার লৌহ বর্মাচ্ছাদনের ওপর সসঙ্গিন রাইফেল বাগিয়ে বসেছিল এক গোরা সৈনিক। সে এবার নিচে নেমে এলো। মাত্র হাত কয়েক দূরে ছেলের দলটা। তাদেরই একজনের বুক লক্ষ্য করে গোরা সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো।

—লুক্, লুক্ এ্যাট দ্যাট ওয়াকিং মমি!

ভিড় ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে কাকে আসতে দেখে সাঁজোয়া গাড়ির ভেতর থেকে কে এক গোরা সকৌতুকে চীৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ততক্ষণে ছেলেদের আড়াল দিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেছে কোরবান : লে মার, মার গোলি, শালা জালিমকা বাচ্চা, মার না? তেরি—হিংস্রভাবে খিঁচিয়ে উঠে একটা অশ্লীল গাল দিলে কোরবান। দিশেহারা ক্রোধে তখন তার সর্বাঙ্গ বাঁশপাতার মতো কাঁপছে থর থর করে।

টমিটার চোখদুটো একবার ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেই বিচিত্র স্নিগ্ধতায় স্তিমিত হয়ে এলো। আর একটু হলে টান দিয়ে বসেছিল ট্রিগারে। ক্রূর কৌতুকের বিদ্যুৎ চমকে গেল টমিটার চোখে। উঁচানো রাইফেলের নলটা সে গম্ভীর চালে আভূমি নামিয়ে নিলে।

কোরবান ঘুরে দাঁড়ালো : যা বেটা—ঘর যা।

চক্ চক্ করছে টমিটার চোখ। ঠোঁটের কোণে তার আলগা ভাবে মৃদু হাসির একটা রেখাই না ফুটে রয়েছে? একটু ইতস্তত করে ছেলেরা সরে যাবার জন্য পা

বাড়ালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে টমিটার হাতে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠলো রাইফেলটা। অস্ফুট এক অন্তিম চীৎকারে ছেলেটা মাটিতে ঢলে পড়লো।

যেন কারবালার ময়দানে এসে আজ দাঁড়িয়েছে কোরবান। জবরদস্ত জালিম এজিদের সেই কারবালা—শহীদ হাসান-হোসেনের রক্তস্মৃতি জড়িত মরু-ময়দান।—খুনিয়ারী কোরবানের মস্তিষ্ক কোষের ঝিল্লিতে ঝিল্লিতে বিশৃঙ্খলতার মত্ত দোলানি লেগে গেল। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিংহ বিক্রমে আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কোরবান শেখ। চোখের পলকে ঝাপটা মেরে ছিনিয়ে নিলে রাইফেলটা।

কিন্তু বোল্ট্ এ্যাক্‌সন্ আর্মি রাইফেল। এতো আর ছোরা নয় যে হত্যার উল্লাসে কোররানের হাতে রুদ্রমূর্তি হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নাচতে শুরু করে দেবে। অনভ্যস্ত মারণাস্ত্র। আনাড়ীর মতো মুহূর্তখানেক অধীরভাবে সেটা নাড়াচাড়া করলে কোরবান। একটা লোহার ডাণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করারও উপায় নেই। তবে? তবে?—কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাত্র একটি মুহূর্ত পরেই কোরবানের অধীর চোখের তারায় বিদ্যুতের মতো ঝিকিয়ে উঠলো রাইফেলের ডগার উদ্যত সঙ্গিনটা। এবং পরক্ষণেই টমিটার বুকে সেটা আমূল চালিয়ে দেওয়ার জন্য সে ক্ষিপ্রহাতে রাইফেল বাগিয়ে ধরলে।

কিন্তু বিঁধিয়ে দেওয়া হোলো না। তার আগেই কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষের মতো মাটিতে হুমড়ি খেয়ে কোরবান পড়ে গেল। কলিজার খুনে দেখতে দেখতে ভিজে উঠলো তার বুকের ধব্ ধবে ব্যাণ্ডেজটা। সাঁজোয়া গাড়ির পিপ্ হোল দিয়ে ব্রেন গানের নলটা তখনো উঁকি মেরে রয়েছে—তখনো সেটার মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটা অতি ক্ষীণ সূক্ষ্ম রেখায়।

* * * *

থানা আর মর্গ। মর্গ আর থানা।—এক পর্দা জুতোর সোল খুইয়ে অবশেষে ছাড়পত্র মিললো। আর অপরাহ্নে শবযাত্রা এসে দেখা দিলে ডাক্তার বসুর বাড়ির সামনে। ডাক্তার বসু অপেক্ষাই করছিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন তিনি। শবাধার নামিয়ে রাখলো বহনকারীরা। কী দেখে হঠাৎ চমক লাগলো ডাক্তার বসুর। দ্রুতপায়ে তিনি আবার গিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠে গেলেন ছাদে। হাওয়ায় পত্ পত্ শব্দে তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে। সেটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এলেন ডাক্তার বসু।

পাশাপাশি দুটো পতাকা দিয়ে শবাধার ঢাকা। একটি, বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের তরফ থেকে দেওয়া লাল ঝাণ্ডা—অন্যটি, আব-হেলাল চিহ্নিত সবুজ—শহীদের প্রতি মহল্লার মুসলিম লীগের সশ্রদ্ধ নজরানা।

ডাক্তার বসু এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে জানু পেতে বসলেন। ধীরে ধীরে শবাধারের মাঝামাঝি বিছিয়ে দিলেন তেরঙ্গা পতাকাখানা। মুহূর্ত কয়েক নির্বাক হয়ে রইলেন অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন : এবার চলো।

ডাক্তার বসুর পাশে এসে দাঁড়ালো কম্পাউণ্ডার। সসঙ্কোচে বললে, আপনিও কী যাচ্ছেন? রায়বাবুদের বাড়িতে যাবার একটা আরজেণ্ট্ কল্ ছিল যে।

মন্থর গতিতে শবযাত্রা আবার চলতে শুরু করেছে। সকলের সঙ্গে মিশে নগ্নপায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন ডাক্তার বসু।

আর খুকীর হাত ধরে ডাক্তার বসুর স্ত্রী দোতালার বারান্দা থেকে চলন্ত শোক-মিছিলের দিকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়েই রইলেন।

বুলবুল চৌধুরী

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

দুই

রবিবার বিকালে রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়াল হলে অনন্তলালকে একটি বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হল। শুধু বিকালে নয়, সমস্ত রাত ধরেও বটে। সভাটা হল বিকালে, ঘণ্টা দুই। তারপর রাত দশটা থেকে কাকডাকা ভোর পর্যন্ত হলের স্থায়ী স্টেজে অভিনয় করা হল 'বঙ্গেবর্গী' নাটক ও 'শিক্ষিতা বৌ' প্রহসন। এটাও যে অনন্তলালের সম্বর্ধনারই অঙ্গ বিকালে সভায় তা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই জেলা শহরে একটি মস্ত এ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাব আছে, প্রতিষ্ঠা ১৯১৮ সাল ইং। সাত আট বছর ধরে ক্লাবটি প্রতিবছর গড়ে তিনটি নাটক, প্রত্যেকটি নাটকের সঙ্গে ছোট একটি প্রহসনও, মঞ্চস্থ করে শরহবাসীকে আনন্দ দিয়ে আসছে, অসহযোগ আন্দোলন চলবার সময়টা ছাড়া। আন্দোলন একটু থিতিয়ে এলে, যারা জেলে গিয়েছিলেন অধিকাংশই তখনো বেরিয়ে আসেননি, ক্লাব তার সভ্য তরুণ উকিল নরেন দস্তিদারের স্বলিখিত একটি স্বদেশী নাটকের অভিনয় করে শহরবাসীর হৃদয় জয় করে। নাটকটি ছিল খুবই কাঁচা আর অত্যন্ত ফেনিল ও করুণ। দেশের জন্য ত্যাগ করা, এমন কি নায়িকাকে পর্যন্ত, ছাড়াও অন্য বড় বড় কথা ছিল অনেক, তবু নাটকটা ছিল শুধু ব্যর্থতা ও হতাশার বেদনায় ভরা, পরিণতিটা মিলনাত্মক হলেও। তখনকার মানসিক অবস্থায় ওটাই মর্ম স্পর্শ করেছিল সকলের। সংঘর্ষের অভাব, জীবন্ত তেজ ও বিক্ষোভের অভাব বিশেষ কেউ অনুভব করেনি, শুধু ব্যথায় কাতর হয়ে মনটা আঁকুপাঁকু করেছিল সকলের যে, মানুষ যা চায় তা হয় না কেন!

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজকুমার জয়শ্রীতিলক, এখন সে-ই সীতাপুরের রাজা। গোড়ায় সে অভিনয় নিয়ে মেতে উঠেছিল, ক্লাবের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছে। রাজা হবার পর অন্য কড়া কড়া নেশায় মেতে পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে এ্যামেচার থিয়েটার করবার বা করাবার নেশাটা জলো হয়ে গেছে তার কাছে। আজও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নাম থাকলেও ক্লাব তাকে আর একরকম পায় না, তার টাকাও পায় কদাচিৎ যৎকিঞ্চিৎ। অনন্তলাল মাসে দশটাকা করে চাঁদা দিয়ে এসেছে, এবার এখানে এসে সকলে ধরে পড়ায় ক্লাবের ফাণ্ডে এককালীন দান করেছে আড়াইশো টাকা। আরও সপ্তাহ দুই রিহার্সাল দেবার দরকার ছিল নাটকটা ভালমত খাড়া করতে কিন্তু অনন্তলাল চলে যাবে কালকেই, তাই আজ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে অভিনয় করা হচ্ছে। অভিনয়ে কিছু খুঁত হবে সন্দেহ নেই কিন্তু কে ধরবে খুঁত মফস্বলের শহরে এই বিখ্যাত দলের অভিনয় বিনা পয়সায় দেখতে এসে!

এদের থিয়েটার সত্যই এখানে একটা উৎসব পরবের মত। ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়,

পান, বিড়ি, লেমোনেড, চা, যারা বিক্রি করে তাদের মধ্যেও। বাড়ী বাড়ী মেয়েরা তাড়াহুড়ো হৈ চৈ করে বেলাবেলি রাঁধাবাড়া সারে, আগ্রহে উত্তেজনায় তাদের ওলোট-পালট হয়ে যায় কথাবার্তা চলাফেরা কাজকর্ম, সূর্যাস্তের আগেই ভয় ঢুকে উন্মনা করে দেয় যে যাওয়া কি হবে, বসবার জায়গা কি জুটবে! উতলা হবার জন্য পুরুষেরা ঠাট্টা করে মেয়েদের, তেমন সম্পর্ক হলে ধমকও দেয়, কিন্তু মনে মনে তারাও কম উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে না সময়মত যাবার জন্য, আগে থেকে পাট করা জামাটি, ফর্সা কাপড়টি ঠিক করে, জুতোতে কালি লাগিয়ে রাখে। ওসব বালাই যাদের নেই, রান্নাবান্নার হাঙ্গামারও নয় ফর্সা জামা কাপড়েরও নয়, অর্থাৎ গরীবদের, তারাও অনেকে শুনতে যায় থিয়েটার। কয়েকটা বেশী পয়সার ব্যবস্থা রাখে, কিছু বেশী পান ও বিড়ির জন্য খাস। আগে গেলেও তারা সামনে বসতে বা দাঁড়াতে পায় না। পিছনের বেঞ্চে কয়েকজনের স্থান হয়, বাকী সব দু'পাশে ও পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সারারাত থিয়েটার স্থাখে ও শোনে। অনেকে ভাবে যে বাবুদের এমন বোকামি কেন, লম্বাটে ঘরের এক মাথায় পালা না করে ফাঁকা জায়গায় আসর করলেই হয় চাদ্দিকে স্থান রেখে, ঘিরে বসে মানুষ শুনতে পারে।

রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়েল হলটি অভিনয় করার উদ্দেশ্যে থিয়েটার হলের মত করেই তৈরী। মেঝে ও উঁচু দেয়াল পাকা, উপরে কাঠের আচ্ছাদন, তার উপর টিনের চালা। গাদাগাদি করে হাজার খানেক লোক ধরে। ক্লাবের প্রত্যেক অভিনয়েই গাদাগাদি মানুষ হয়।

একটু ফাঁকায় হলটা তৈরী করা হয়েছে জায়গার সুবিধার জন্য, কাছাকাছি বাড়ী-ঘর বেশী নেই। শহরের সভাসমিতি সব কিছুই প্রায় হয়ে থাকে আদালত এলাকা ও শহরের বসবাসের এলাকার মাঝামাঝি চৌকো টাউন হলটাতে। কদাচিৎ বিরাট জনসভা হলে ফাঁকা মাঠে। এই হলটি শুধু যেন আছে অভিনয় করবার জন্য, এখানে সভা করার, এমন কি বিরাট জনসভা করার পর্যন্ত এত সুবিধা, কিন্তু নাটক অভিনয় ছাড়া সারা বছর ওখানে কিছুই হয় না। বোধ হয় এই কারণে যে সেটাই দাঁড়িয়ে গেছে প্রথা। টাউন হলটি পুরানো, দেয়ালে কয়েকটি বড় বড় তৈলচিত্র, কয়েকস্থানে বসানো কয়েকটি মর্মর মূর্তি এবং টেবিল চেয়ার বেঞ্চগুলি অযথা ভারিক্কি গঠনে গুরুগম্ভীর। ভারিক্কি লোকেরা ওখানে সভা করতেই হয়তো তাই ভালবাসেন।

সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে মেমোরিয়েল হলটির আশেপাশের জায়গা, সন্ধ্যার পর সেখানে হয়তো শেয়ালও ঘোরাফেরা করে নিঃশঙ্ক চিত্তে, অসংখ্য বাদুড় চামচিকে যে হলটার ভেতরে বাসা বেঁধেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অভিনয়ের রাত্রেও—অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতার সময়েও হয়তো চামচিকে নায়কের গালে ঝাপটা দিয়ে নায়িকার ওড়নায় জড়িয়ে গিয়ে দর্শককে হাসায়। তবে তাতে অভিনয় মাটি হয় না। আধ মিনিট পরে কেউ মনেও রাখে না চামচিকের কথা।

নিখিল ঘোষাল এই ক্লাবের সেরা অভিনেত্রী! ক্লাব স্থাপনের পর প্রথম নাটকে সতর আঠার বছর বয়সে সে নায়িকার পার্ট করেছিল, সাত আট বছর পরে আজও কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে পারল না। পড়াশোনা ছেড়ে সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকরী নিয়েছে, পাড়ার একটি কালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করেছে বছর দুই আগে বাড়ীর লোকের সঙ্গে লড়াই করে, ক'মাস আগে একটি মেয়ে

হয়েছে তার। রোগা ছিপছিপে গড়নটি তার অবিকল বজায় আছে, গোঁফদাড়ি কামিয়ে মুখে রঙ মেখে বুকে পরানো কাঠের বর্তুলি ছটি এঁটে নিজের স্ত্রীর একখানা জমকালো সিল্কের শাড়ী পরে (ক্লাবের সভ্যরা অভিনয়ের জন্য দরকারী সাধারণ পোশাক নিজেদের বাড়ী থেকেই আনে, বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ক্লাবের আছে) সে যখন এবারও স্টেজে এসে দাঁড়াল, গুরুজনেরা তাকাল সচকিত হয়ে, মেয়েদের চোখের কোণে ঝিলিক মেরে গেল ঈর্ষা !

কবে বর্ণী এসেছিল বঙ্গে, তখনকার মেয়েদের বিশেষ বেশ ধারণ করার সুযোগে একেবারে মোহিনী হয়ে নিখিল নেমেছে স্টেজে, বাস্তব জীবনে কোনো মেয়ের আজ সে সুযোগ স্বাধীনতা অধিকার নেই !

ভুবনের বড় ছেলের বিধবা বোন চপলা তাঁর মেয়েকে বলেন, ওরকম সাজতে ইচ্ছে হচ্ছে তোর !

পনের বছরের সরযূ বলে, কি রকম মানিয়েছে দ্যাখ মা !

মানিয়েছে, স্টেজে মানিয়েছে, চপলা বলেন, মেয়েকে অত্যন্ত বিরক্ত করছেন জেনেও ধীর-স্থির ভাবে, তুমি যদি বাড়ীতে ওরকম বেশ কর, স্কুলে যাও, সবাই হাসবে। পাকাও হাসবে। তাছাড়া কি জানো, তখনকার দিনেও কোন মেয়ে ওরকম বেশ করত না। কোন মেয়ে তখন এরকম বেশ করলে তখনকার লোকেরাও ভাবত সং সেজেছে।

মা, আমি রানীর কাছে গিয়ে বসি ?

বসো।

চপলা নিশ্বাস ফেলেন। উপায় কি।

সুধার সঙ্গে কথা বলে চপলা। ভুবন ও ভৈরবের বাড়ীর মেয়েরা কেউ কারো বাড়ী বেড়াতে যায় না বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কথা বন্ধ নেই। কথা না বলে দূরত্ব বজায় রাখাটা আসে না মেয়েদের। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস গুজগাজ নিন্দা ও সমালোচনা চলে অদূরস্থ অন্য বাড়ীর মেয়েদের, দূর থেকে এড়িয়ে চলা চলে, সামনে পড়লে পরিহার করাটা ধাতে সয় না। নলিনী দারোগার বৌটাকে পর্যন্ত ছেঁটে ফেলতে পারেনি মেয়েরা এখানে, পারলে দোকান সাজানোর মত গয়না আর অদ্ভুত ঝলমলে শাড়ী পরে বেচারি ঘেঁষাঘেঁষি মেয়েদের মধ্যে একেবারে একা হয়ে যেত, সাথী থাকত শুধু তার ন'মাসের ছেলে রাখবার ঝিটি।

অহঙ্কারে এমনিই তার গলা উঁচট, বুক চেতানো, আরেকটু অহঙ্কার বেড়ে নিজে থেকেই সে যদি একা হয়ে যেত কারো সঙ্গে কথা না বলে, সকলে খুশি হত, স্বস্তি পেত। পান চিবিয়ে চিবিয়ে তার কাটা কাটা কথা, নাক সিটকানো, বয়স্কাদেরও তুমি তুমি করা, ভুল করে অন্তটার বদলে আজ এই জড়োয়া নেকলেসটি পরে আসবার কথাটা হাজারবার উল্লেখ করা—শুনতে শুনতে সকলের গা জ্বালা করে। বড়ঘরের মেয়ে-বৌয়েরা নানা কৌশলে স্থান অদল বদল করে একটু সরে যায়, পিক ফেলতে উঠে গিয়ে ফিরে এসে অন্য একজনকে নিজের খালি জায়গায় বসিয়ে নিজে বসে তার জায়গায়। একসময় দেখা যায়, নলিনী দারোগার বৌ যাদের মধ্যে এসে বসেছিল তারা আর নেই তাকে ঘিরে, গরীব মধ্যবিত্তের বৌ, বয়স্কা গৃহিনী আর বিধবাদের মধ্যে সে শোভা পাচ্ছে। তার বসার উদ্ধত ভঙ্গি বদলে গেছে, কথা ও কমেগেছে আশ্চর্য রকম !

ভুবনকেও আসতে হয়েছে অনন্তলালের সম্বর্ধনার সভাটি বাদ দিয়ে এই অভিনয় উপলক্ষে। এখানে না এসে উপায় নেই, লোকে ভাববে তাকে বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়নি, সে বুঝি বাদ পড়েছে। সামনে সম্মানের আসনে ভৈরবের পাশেই তাকে বসতে দেওয়া হয় অন্যান্য গণ্যমান্যদের সঙ্গে, ভৈরব ও অনন্তলালের সঙ্গে ভদ্রতার অমায়িক আলাপও তার চলে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা উঁচুদরের হাকিমরা কেউ এখানে আসে না, তাদের বসবার স্পেশাল স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নেই। ভৈরব, ভুবন, অনন্তলাল প্রভৃতি বিশেষ মান্যগণ্যেরাও সাধারণত নাটক আরম্ভের একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মধ্যে উঠে যায়।

রাতের পর রাত যে শূন্য নির্জন হলটিকে ঘিরে অন্ধকারে মেঠো বাতাস কেঁদে ফেরে, আজ তার ভিতর ও বাইরে এত হৈ চৈ কলরব আলোর ছড়াছড়ি ভোজ বাজির মত অদ্ভুত লাগে, রাত্রি জাগরণের এমন উপভোগ্য উন্মাদনার মধ্যেও ভোলা যায় না কাল আলোহীন শব্দহীন এই পরিত্যক্ত স্থানটি দূর থেকে দেখেও মনটা বড় খারাপ হয়ে যাবে। স্বপ্নের মত মিথ্যা মনে হবে আজ রাত্রের উৎসব, আনন্দ, কোলাহল।

মনে হবে তো কি ? কানাই বলে ভ্রূকুটি করে।

হবে তো কি মানে ? মনে হবে তাই বলছি। কি আশ্চর্য মনটা আমাদের ! পাকা বলে গম্ভীর হয়ে। অন্য একটি ছেলের সঙ্গে অনেক পরে কানাই থিয়েটার দেখতে এসেছে। এসে একেবারে বসে পড়েছে জায়গা দখল করে, তাদের যেন বসে দাঁড়িয়ে এখান থেকে বা স্টেজের ভেতরে গিয়ে থিয়েটার দেখার কথনো অসুবিধা হয়, সাজঘরে ঢুকে আড়ালের ব্যাপারগুলি পর্যন্ত দেখবার ইচ্ছা হলে কেউ ঠেকাতে পারে। কানাইয়ের সঙ্গে ছেলেটিকে চেনে না পাকা।

সিগেট টেনে আসি চ'।

নাঃ, কানাই বলে একান্ত অবহেলার সঙ্গে, ছেড়ে দিইছি। ভাল লাগে না। গলা খস খস করে। মাথা ঘোরে। মিছি মিছি পয়সা নষ্ট।

কানাইয়ের মুখে এমন গুরুজনী কথা ! পাকা হেসে সরে যায়। নরেশ কিন্তু একটা গুরুতর কথা বলে তাকে। কানাই নাকি সত্যই বিড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে, তাদেরও ত্যাগ করেছে। শুনে তখন খেয়াল হয় পাকার যে কানাই তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি, তাকে আমল দেয়নি। কানাই তার সঙ্গে মিশবে না ? নতুন বন্ধু পেয়েছে ? বহুত আচ্ছা, কেঁদে কেঁদে সে মরে যাবে !

দু'মিনিটের মধ্যে সে ভুলে যায় কানাইকে, একবার সাজঘর ঘুরে আসে, সিদ্ধেশ্বরের কাছে মালাই কিনে খায়, সিগারেট টানে, পান চিবোয়, মানুষের রকম দেখে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভেতরে বাইরে এখানে সেখানে পাক খেয়ে বেড়ায়, ঢুপ উঠলে একটা সিন স্টেজে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিন সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাগে। তার প্রাণ আনন্দে উচ্ছল, সেখানে তুচ্ছ সুখদুঃখের স্থান নেই। কেবল সে একা নয়, ছেলেবুড়ো সকলেই যেন এখানে আজ কি একটা গভীর লজ্জা

ও দুঃখের, আত্মকৃত অপরাধের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়েছে, কর্তব্য হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে এই উৎসবকে, আনন্দে মশগুল হয়ে যেতে। ছেলেরা চঞ্চল, একটু উচ্ছৃঙ্খল, বড়রা একটু ধীরস্থির কিন্তু ভাব প্রায় একরকম সকলের। আনন্দের উপলক্ষ হিসাবে সারারাতের থিয়েটার তো আগেও ছিল এখনো আছে, কিন্তু তাতেই সবাই খুশি নয়, এই উপলক্ষকে নিঙড়ে নিঙড়ে শেষবিন্দু আনন্দ আহরণ করলেই শুধু চলবে না, নিজের ভেতরের উত্তেজনা উন্মাদনা দিয়ে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে হবে সে উপভোগকে। নাটক, অভিনয়, দৃশ্যপট ভাল কি মন্দ কেউ যেন তা বিচার করে না, যে রসটুকু পরিবেশন করা হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে তাতে নিজের তাগিদেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দর্শকেরা। ভাল করে যে নাটক দেখছে না, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে চঞ্চলভাবে, বাইরে যে রয়েছে নাটক না দেখেই, তার মুখখানাও উত্তেজনায় স্ফুরিত।

তাছাড়া, তুচ্ছ কারণে, হয়তো একেবারেই অকারণে আজ ক্রমাগত গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে দর্শকদের মধ্যে, বিশেষ করে বয়স যাদের কম। একটা বাধা কাটিয়ে দেখতে দেখতে নাটক জমজমাট হয়ে ওঠে, অভিনেতাদের যেন কিছুমাত্র সাধ্য সাধনারও দরকার হয় না, হঠাৎ হয় তো এককোণে হাতাহাতি বাধবার উপক্রম ঘটে যায় একজনের কনুইয়ে আরেকজনের একটু গুঁতো লাগায়, অথবা একজন আরেকজনকে মাথাটা পকেটে ভরতে অনুরোধ করেছে বলে। এই হলে আজকের মত অভিনয়ও কখনো আর এমন জমেনি, আন্দোলন থামবার পর সেই স্বদেশী নাটকটির অভিনয়ও নয়, এমন গণ্ডগোলও কোনোবার দেখা যায়নি দর্শকদের মধ্যে।

লোকে বিরক্ত হয় অল্পক্ষণের জন্য, গোলমাল থামলে তখন সেই ফ্যাকরাটাও যেন উপভোগ করে। একঘেয়ে জীবনে অভিনয় একটা নতুনত্ব, চিরকেলে একটানা অভিনয়ে গোলমাল যেন আরেকটা নতুনত্ব, মজার ব্যাপার।

কয়েকজনের ভাল লাগে না। যেমন সপরিবারে মুন্সেফ সুরেন ঘোষালের। টসটসে মিষ্টিরকম মোটা স্ত্রী, কাঁদ-কাঁদ-মুখ কিশোরী মেয়ে ও ছ'সাত বছরের দুটি গম্ভীর চুপ-চাপ যমজ ছেলে।

তাকে দেখে যেন অকূল পাথারে কূল পেল সুরেন।

পাকা, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। বেয়ারাটাকে এখানে থাকতে বলেছিলাম, ব্যাটা যেন কোথা ভেগেছে!

কোথা দাঁড়িয়ে থিয়েটার শুনছে।

আমার যে এদিকে মুস্কিল ভাই। উনি বলে পাঠাচ্ছেন, ভিড়ে ওঁর ফিটের উপক্রম হচ্ছে, এখুনি বাড়ী যাবেন।

বাড়ী নিয়ে যান?

কোথা গাড়ী পাই, কি করি—সুরেন যেন কেঁদে ফেলবে।

ভৈরব ও অনন্তলাল তখনো যায়নি। পাকা গিয়ে দাবী জানায়, একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে, মামার গাড়ীটা একটু চাই আধঘণ্টার জন্য।

অনন্তলাল বলে, আমি যে বাব ভাবছিলাম? তোর নতুনমামী—

নতুনমামী থাকবে বলেছে, পাকা স্পষ্ট মিথ্যা জানায়।

গাড়ীটা পাওয়া যায় ভৈরবের, সুরেন সপরিবারে উঠে বসে গাড়ীতে, কিন্তু পাকা নিজেই গোল বাধায় সব বিষয়ে তার কর্তালি করা স্বভাবের দোষে। গঙ্গা কামার, সৈদাবাজারের দক্ষিণে গলির মোড়ের কাছে তার কামারশালা আছে, পানের দোকানের সামনে মাটিতে বৌটিকে শুইয়ে তার কপালে বরফ ঘষে দিচ্ছিল, বৌটি সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চারিদিক ঘিরে কাঁদছিল এগারো থেকে দেড় বছরের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। পাকা মাঝে মাঝে ওর দোকানে উবু হয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, নেহাই-এর উপর তাতানো লোহা থেকে হাতুড়ির আঘাতে আগুনের ফুলকি ছোটা, দেখেছে দু'হাতে হাতুড়ি তুলে প্রাণপণে যে ঘা মেরেছে সেই ধুমসো কালো সহকারীটির ডাকাতের মত চেহারা। গঙ্গাকে জিজ্ঞেস করেই সে এক অভ্যায় প্রস্তাব করে বসল। ওদেরও তুলে নিতে হবে গাড়ীতে, আগে ওদের পৌঁছে দিয়ে সুরেনদের বাড়ী যাবে গাড়ী।

হাসপাতালে নিতে হবে না তো?

না বাবু। ঘর গিয়ে একটু শুয়ে রইলে ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে এমন হয়।

সুরেন চটে বলে, পাকা, এ গাড়ীতে কখনো জায়গা হয়?

তার স্ত্রী অনুরাধা বলে অধীর হয়ে, আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক না, তারপর ওদের নিয়ে যাবে?

তুমি গাড়ী চালাও তো ড্রাইভার, ও পাগলের কথা শুনো না—বলে কিশোরী মেয়ে মায়া।

তবে আপনারা নেমে একটু ওয়েট করুন, পাকা বলে, আগে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। দেখছেন না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে?

সুরেন বলে, পাকা, শুনে যাও, কাছে এসো!

অনুরাধা বলে, পাকা তুমি ভারি ই'য়ে কিন্তু!

মায়া বলে, পাকাদা!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। গঙ্গা কামারকেও সপরিবারে স্থান দিতে হয় গাড়ীতে—বৌকে বুকে কোলে নিয়ে এক কোণে বসে যথা সম্ভব কম জায়গা দখল করার চেষ্টা করে গঙ্গা, কিন্তু হলে কি হবে, তার পরিবারটিই প্রকাণ্ড। ড্রাইভার মাথন একটু বিরক্তি ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গিয়েছিল গঙ্গারা গাড়ীতে উঠবার আগেই: কি করছেন দাদাবাবু, বাবু জানতে পারলে—

চোপরাও!

সে গর্জনে শুধু ড্রাইভার নয়, সুরেনও সপরিবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুধাও এদিকে অনন্তলালকে জিজ্ঞেস করে পাঠায়, বাড়ী ফিরতে দেরী কেন। এসব যাত্রার মত অভিনয় ও লোকের তা উগ্র আগ্রহে শোনা বেশিক্ষণ ভাল লাগে না সুধার। অনন্তলাল বলা মাত্র তিনটি ছেলে খুঁজে পেতে এনে হাজির করে দেয় পাকাকে, সঙ্গে আসে নরেশ। নরেশকে হঠাৎ কিছু সদুপদেশ দেবার সাধ জেগেছিল পাকার। বাইরে থেকে যা মনে হয় অপরূপ অদ্ভুত, ভেতরে সেটা যে শুধু ফাঁকির ব্যাপার, এটা বোঝানোর জন্য নরেশকে

সে সাজঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে সাজা নিখিলেশকে দেখিয়ে বলছিল, বাইরে থেকে কেমন ছাখায়, আর কাছে থেকে কেমন ছাখায় ছাখ। গা ঘিন ঘিন করে না দেখলে?

অনন্তলাল বলে, তুমি বললে থাকতে চায়, এদিকে দেখি যাবার জন্য তোমার মামী ব্যস্ত।

নতুন মামী আজ রাত্রে যাবে? হুঁঃ! দাঁড়ান আমি দেখে আসছি।

সুধা বলে, ভাল লাগছে না আমার। খালি বীরত্ব আর চীৎকার—

পাকা বলে, এ ঘুপটির মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকলে ভালো লাগে? চাদ্দিকে একটু ঘোরো ফেরো ছাখো শোন—

ওমা, থিয়েটার চাদ্দিকে ছড়ানো থাকে নাকি? বাইরে পর্যন্ত?

থাকে না? চাদ্দিকেই তো আসল থিয়েটার।

তা নয় হল। শরীরটা যে ভাল লাগছে না?

শরীর ভাল লাগছে না? চলো এখুনি তবে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। গাড়ী জোগাড় হয়ে যাবে।

সুধার গলায় কথা আটকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। এই অনিয়মকে নিয়ে কি করা উচিত ভাববারও সময় নাই।

ও কিছু নয়। আর একটু দেখেই যাই। বাড়ী দিয়ে আসতে পারবে তো?

পারব না?

সকলের সঙ্গে গেলে হবে না কিন্তু, ওরা রাত কাবার করবে। আমি অত রাত জাগতে পারি না।

কানাই কখন উঠে চলে গেছে তার নতুন বন্ধুটির সঙ্গে পাকা টের পায়নি। কানাইকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধুও ত্যাগ করেছে। তার সঙ্গে মিশে বখে যাবার ভয় হয়েছে নাকি ওর?

নরেশ সঙ্গে লেগে ছিল গোড়া থেকে, মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য সেও যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল কোথায়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সে আবার এসে সঙ্গ ধরল।

পাকা, তুই আমাকে চাস কিনা বল তো স্পষ্ট করে?

তার মানে?

মানে, তুই যদি আমার বন্ধুত্ব না চাস, সোজা কথায় বল, আমি কানাইয়ের দলে যাই।

কানাই দল করেছে নাকি?

দল নয়, তোর সঙ্গে কানাই মিশবে না।

তুই কানাইয়ের দলে যা নরেশ।

এইজন্য তো কেউ তোকে দেখতে পারে না! নরেশ আহত হয়ে কোঁস করে ওঠে। লেগে থাকে পাকার সঙ্গেই।

গাড়ী ফিরে এলে ভৈরব আর অনন্তলালের সঙ্গেই পাকা নতুনমামীকে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। তার হুকুমের ভঙ্গিতে কথা বলা শুনে সুধা হেসে ফেলে।—থিয়েটার দেখব না?

না, খারাপ শরীরে রাত জাগতে হবে না।

তোমায় জাগতে হবে, কেমন?

বড় নাটক শেষ হয়ে প্রহসন আরম্ভ হতে হতে চারিদিকে ফর্সা হয়ে এল। তখন পাকার খেয়াল হল, আজ তার ব্যায়ামের আখড়ায় যাওয়ার কথা, কালীনাথকে কথা দিয়েছে। ঘাটে নেমে মুখে চোখে জল দিয়ে দোকানে এক কাপ চা খেয়েই সে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে। সাইকেলটা আনলে এখন কাজ দিত।

চলতে চলতে পথে এক অদ্ভুদ গুঞ্জব শোনে পাকা। মাঝ রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরার পথে নলিনী দারোগার স্ত্রীর গায়ের গয়না ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা নাকি ভদ্রঘরেরর ছেলে, মুখোশ পরা ছিল। নলিনী দারোগার স্ত্রীকে তারা নাকি বলেছিল, মা, আপনার বিয়ের গয়না রেখে অন্যগুলি খুলে দিন—আমরা কিন্তু জানি কোনটি কোনটি আপনার বিয়ের গয়না। তারা নাকি আরও বলে দিয়েছে যে আজ মহাপাপের গয়নাগুলি গেল, স্বামী যদি তার সাবধান না হয় একদিন তাকেও হারাতে হবে!

আখড়ায় পৌঁছবার তাড়ায় খবরটা ভাল করে শুনবারও সময় সে পেল না। ছেলেরা সবাই ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে, খেলা ও ব্যায়াম শুরু হয়েছে। কালীনাথ হাজির ছিল, পাকা পৌঁছতেই কাছে ডাকল।

পাকা, তোমার নাম কাটা গেছে। তুমি আর এখানে এসো না।

ক্রমশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কুকুর

[এই গল্পটি "বা-জিন"-এর "ডগ" গল্পের অনুবাদ।

"বা-জিন" চীনের প্রগতি-লেখকদের অন্যতম। ১৯১৭-এ চীনের সাহিত্য-জগতে যে যুগান্তর আসে, তাতে "মাও-তুন", "লু-সুন", "য়ু-টাকু" প্রভৃতির ন্যায় তিনিও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি শুধু চীনের তরুণ-তরুণীদের কাছেই সমাদৃত হয়নি জাপ তরুণ-তরুণীদেরও মন আকৃষ্ট করেছে। তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর সমস্ত লেখার জাপানী অনুবাদ। তাঁর কয়েকখানা বই রুশ, জার্মান এবং ফরাসী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় "কুকুর" গল্পটি ছাড়া আর কিছুই অনূদিত হয়নি। এ গল্পটি চীনা ভাষায় একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে।

"বা-জিন" নিজেকে অ্যানার্কিস্ট বলে পরিচয় দেন। কুয়োমিনটাঙের অত্যাচারে তাঁকেও জর্জরিত হতে হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি বইই চিয়াং-সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ বই হোলো "দি ডেড্" আর "দি টেম্পেস্ট"।]

কুকুর!

আমি নিজেই জানি না আমার কি নাম। বাস্তবিক আমার নাম করণ হয়েছিল কি না তাও মনে পড়ে না। আমার বয়স যে কতো তাও সঠিক বলতে পারি না। আমি যেন হঠাৎ এই দুনিয়ায় এসে পড়েছি, এর সাথে আমার যেন কোনো সংযোগ নেই। কোনো এক অজানা স্থান থেকে যেন কেউ আমাকে তুলে নিয়ে উপেক্ষা ভরে এই দুনিয়ার মাঝে নিক্ষেপ

করেছে। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে নিজেই অজ্ঞাতসারে পা দিয়ে সামনের নুড়িকে পদাঘাতে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে দেয় তেমনি কে যেন এই দুনিয়ায় আমাকে সেইভাবে তাড়না করছে। আমার মা-বাপের পরিচয় আমার জানা নেই। আমি এই দুনিয়ায় পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত ও অনাদৃত। এই যে পথে পথে অসংখ্য বেঁটে লোক দেখছো যাদের নাক চ্যাপটা, চোখের তারা কালো, মাথার চুল কালো আর গায়ের রং তামাটে, তাদের মধ্যে দিন কয়েক বেঁচে থাকাই বুঝি আমার ভাগ্য-দেবতার বিধান।

আর সকলের মতো আমারও একটা বাল্যজীবন ছিল, কিন্তু তাদের বাল্যজীবনের সঙ্গে আমার বাল্যজীবনের ইতিহাসে অনেক গরমিল আছে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে আমার বাল্যজীবন ছিল এক অদ্ভুত জীবন। পাইনি আমি বাল্যজীবনে কারুর স্নেহ, দেয়নি কেউ আমায় করুণা ও মমতা। আমার বাল্যজীবনের স্মৃতিপটে স্পষ্টাক্ষরে শুধু লেখা আছে ক্ষুধার তাড়না, শীতের তীক্ষ্ণতা……তবুও আমার মনে পড়ে (জানি না সঠিক তখন আমার বয়স কত) একটা রোগা লম্বা বৃদ্ধ আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলছিল "এ বয়সে নিশ্চয় তোমার স্কুলে পড়া উচিত। শিক্ষা—হ্যাঁ শিক্ষাই মানুষকে মহৎ করে।" তাঁর ক্ষীণকণ্ঠে ছিল মমতার আবেগ আর তাঁর মুখে ছিল গভীর ব্যাকুলতা। তাঁর সেই উপদেশ আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর কথায় আমি শীতের তীব্র যন্ত্রণা ভুলে, একান্ত আগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্কুলের সন্ধানে।

পথে যেতে যেতে দেখলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব বাড়ি। কতকগুলো দেখতে রাজ-প্রাসাদের মতো আর কতকগুলো জাঁকজমকহীন। পথচারীদের কাছে জানতে পারলাম জাঁকজমকহীন বাড়িগুলোকে স্কুল বলে। ঐখানে গেলে লোক শিক্ষা পায়। সেই বৃদ্ধ লোকটি আমায় যে কথা বলেছিলেন, সারাক্ষণ আমি মনে মনে তা চিন্তা করেছি। তারপর কারুর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা না করে, আমি সাহস করে একটা স্কুলবাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

—"দূর হ নেড়ী কুত্তা! তুই এখানে কেন?"

তারপর এক এক করে সব চেয়ে জাঁকালো প্রাসাদতুল্য বাড়ি থেকে, সব চেয়ে সাধারণ বাড়ির ভেতর যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সেইখানেই পেয়েছি ঐ এক কথার পুনরাবৃত্তি। কোথাও বা পেয়েছি রক্ত-চোখের জ্বালাময় তীব্র ভ্রূকুটি-ভঙ্গী, কোথাও বা পেয়েছি করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার তিক্ত অবহেলা। এই যা তফাৎ।

"দূর হ!"

এই দুটি কথা যেন চাবুকের মতো শপাং শব্দে আমার পিঠে পড়লো। ভয়ে, আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় আমি দেহ সঙ্কুচিত করে, মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলাম। ওদিক থেকে স্কুলের ছেলেদের তীব্র ব্যঙ্গভরা অট্টহাসির উল্লসিত প্রতিধ্বনি আমার কানে আসে।

একান্ত বিস্ময়ে ভাবতে থাকি—তবে কি সত্যি মানুষ নই? যতই ভাবতে থাকি, আমার সন্দেহ ততই বাড়তে থাকে। পাছে সেই প্রশ্নের একটা সঠিক উত্তর নিজে আবিষ্কার করতে পারি, এই আশঙ্কায় সেই প্রশ্ন আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। এ সত্ত্বেও সারাক্ষণ একটা বিদ্রূপের স্বর আমার কানে কানে কেবল এই প্রশ্ন করে: "একি সম্ভব যে তুই মানবগোষ্ঠীর একজন?"

আমি পরিত্যক্ত আশাহীন ও অসহায়। দুনিয়ায় আমার অস্তিত্ব একান্তভাবে

উপেক্ষিত। তাই যে ভাঙ্গা দেউলে আমি রাতে বিশ্রাম করতাম সেইখানে ফিরে যাই। স্থির করলাম ভাঙ্গা দেউলের মধ্যে যে শ্রীহীন দেবতার বিগ্রহ আছে তাঁর কাছে এজন্য দরবার করব। ভাবলাম: দেবতা করুণাময়, তিনি সর্বজ্ঞ, আমার এ-প্রশ্নের উত্তর পাব তাঁর কাছে।

অতীতে এই বিগ্রহের চারিদিকে যে ঘেরাটোপের আবরণ ছিল আজ তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। শ্রীহীন বিকলাঙ্গ বিগ্রহ ধূলিধূসরিত হয়ে নির্জনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলাম।

"হে সর্বশক্তিমান দেবতা, আমাকে বোধশক্তি দাও এই সমস্যা সমাধান করতে। সত্যই কি আমি মানুষ?"

দেবতা নীরব। তাঁর ধূলিধূসরিত মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, তাঁর চোখেও দেখলাম না প্রশ্ন সমাধানের দীপ্ত আগ্রহের শিখা।

নিরুপায় হয়ে নিজেই বসি বিচার বিশ্লেষণ করতে। যারা কোনো বিষয়ে আমার অনুরূপ নয়, কোন সাহসে আমি নিজেকে তাদের সমপর্যায় মনে করি?

আরাম, উত্তাপ ও মানুষের অনুভূতি, এইগুলো সব মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু এই সব অধিকার থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সত্যিকারের মানুষ যা খেতে না পেরে রাস্তার আবর্জনায় ফেলে দেয়, আমি সেই আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খুদকুঁড়ো সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করি। আমি যদি নিজেকে তাদের সমপর্যায়ের লোক মনে করি, তা হলে মানুষ নামের মর্যাদা কলঙ্কিত করা হবে। সত্যই তামি তাদের কেউ নই।

ভাবলাম, বেশ আমি না হয় মানুষ নাই হলাম, কিন্তু এই দুনিয়ায় যখন স্থান পেয়েছি, তখন নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি এসেছি। আমার এই দেহটা হয়তো কোনো কাজে লাগতে পারে। এই দুনিয়ার বাজারে যখন সব কিছুরই কেনা-বেচা চলছে, তখন আমার এই দেহটা বেচলে কি হয়? এই স্থির করে একটা কাগজে আমার মূল্য তালিকা খড় দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম বাজারের মাঝখানে নিজেকে বিক্রয় করতে। প্রথমে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম এক জায়গায়, পরে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম আর এক জায়গায়। ক্রেতাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করবার আশা নিয়ে আমি বারবার নানাভাবে আমার মাথা পা দেহটাকে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। থেকে থেকে শুধু এই কথা ভেবেছি: দয়া করে কেউ যদি আমায় কেনে এবং চারটি চারটি খুদ কুঁড়ো খেতে দেয়, তা হলে আমি তার সব হুকুম তামিল করবো, যেমন করে প্রভুভক্ত কুকুর মনিবের হুকুম তামিল করে।

সেদিন সারাক্ষণ বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আকুল আগ্রহ নিয়ে একবার এদিকে আর একবার সেদিকে ঘোরাঘুরি করেছি যে কতবার তা জানি না, কিন্তু হায়! কোনো ক্রেতাই এগিয়ে আসেনি আমাকে খরিদ করতে। যেখানে গিয়েছি, সকলেই আমার দিকে ঘৃণাভরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। হ্যাঁ, গোটা কয়েক ছোট ছোট ছেলে, একান্ত আগ্রহে আমার দিকে নজর দিয়েছিল, কারণ আমার গলায় যে মূল্যতালিকা ঝোলানো ছিল সেটাতে তারা ভারি কৌতুক বোধ করছিল। আমি যেন তাদের কাছে একটা তামাশার সামগ্রী হয়েছিলাম। শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে আমি ফিরে এলাম দেউলে। ফেরবার পথে আস্তাকুঁড় উল্টে-পাল্টে ধুলো কাদা মাখা যা কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, অসঙ্কোচে সেগুলি গিলতে লাগলাম। খেতে খেতে বার বার মনে হোলো যখন এই সব অখাদ্য অসঙ্কোচে গিলতে পারছি,

তা হলে আমার উদরের সঙ্গে আর কুকুরের উদরের তফাৎ কি? কুকুর ও আমি সমপর্যায় ভুক্ত?

দেবতার ভাঙা দেউলে পরিপূর্ণ নির্জনতা। আমি ছাড়া সেখানে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। দুনিয়ায় নিজের একান্ত অপ্রয়োজনীয়তা বোধ করে উত্যক্ত হয়ে, পরিশ্রান্ত দেহটাকে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি স্পষ্ট সেদিন জানতে পারলাম, আমি যাই হই না কেন, মানুষের কাছে আমার যা মূল্য তা একান্ত তুচ্ছ। নিদারুণ মনোবেদনায় চোখ ফেটে অবিরল অশ্রুধারা ঝরে পড়লো। জানি অশ্রুধারায় মন শান্ত হয়, কিন্তু আমার মত পাষাণের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। কিছুতেই কান্না থামাতে পারি না, অবিশ্রান্ত কেঁদেছি। কান্না ছাড়া আমার আর কি বা ছিল। শুধু দেউলের মধ্যে কেঁদে ক্ষান্ত হইনি, ধনীর দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত কেঁদেছি।

দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে অভুক্ত থেকে বড় বাড়ির ফটকের আড়ালে আত্মগোপন করে কেঁদেছি। ক্ষুধার উৎপীড়নে চোখের নোনা জল জিব দিয়ে সাগ্রহে চেটে চেটে খেয়েছি। বিদেশীয় পোশাক পরা এক যুবক আমার পাশ দিয়ে চলে যায়, কিন্তু আমার দিকে ফিরে তাকায় না। একটু পরে একজন প্রৌঢ়া সেই পথে তাকে অনুসরণ করে; কিন্তু সেও আমার দিকে ফিরে তাকায় না। পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত লোক চলাচল করছে কিন্তু আমার দিকে কেউ চেয়ে দেখে না। তবে কি আমার কোনো অস্তিত্ব নেই?

শেষকালে বাড়ির ফটক খুলে একটা ভীষণাকার লোক বেরিয়ে আসে। আমার কাছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে এসে চীৎকার করে অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে বললো: "দূর হ, এখানে দাঁড়িয়ে নেড়ী কুত্তার মতো কেঁউ কেঁউ করতে হবে না।" তারপর আমাকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে জুতোশুদ্ধ লাথি মারে, যেমন করে লোকে লাথি মারে পথের কুকুরকে।

আমার অশ্রুর উৎস নিঃশেষ হতে, আমি কোনো রকমে শ্রান্ত দেহ নিয়ে দেউলে ফিরে আসি। আমার একমাত্র বন্ধু ভাঙ্গা দেউলের শ্রীহীন বিগ্রহ দেবতার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাই।

"হে সর্বশক্তিমান দেবতা। যদিও দেখতে পাচ্ছি আমি মানবগোষ্ঠীর কেউ নই, তবু ভাগ্যবশে যখন এই দুনিয়ায় স্থান পেয়েছি, তখন নিশ্চয় যে-কোনো উপায়ে বাঁচতে হবে। আমি পরিত্যক্ত অসহায়। আমি জানি না আমার মাকে, আমি জানি না আমার বাবাকে, কিন্তু একজনের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হবে। হে মহান! হে ন্যায়বান, তুমি আমায় আশ্রয় দাও, তুমি আমাকে পুত্র বলে গ্রহণ করো·····মানবগোষ্ঠীর আমি কেউ নই। জীবনে আমি কোনোদিন পাব না মানুষের ভালবাসা।

নির্বাক বিগ্রহ মূর্তি। তিনি আমায় ত্যাগ করেননি·····যাক্ এতদিন পরে পিতৃরূপে পেলাম শ্রীহীন বিগ্রহ দেবতা: যিনি মহান, যিনি ন্যায়বান।

২

আমাকে নিত্যই বাইরে যেতে হোতো, কিছু পেটে দেবার ব্যবস্থা করতে। আঁস্তাকুড় ঘেঁটে এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে যেদিন কিছু পেটে পুরতে পেতাম, সেদিন এক

অভিনব আনন্দ নিয়ে তাড়াতাড়ি দেউলে ফিরতাম। সেদিন মনে মনে ভাবতাম আমি যেন এই দুনিয়ার একজন। মনে হোতো দেউলের বিগ্রহ দেবতা আমার বাবা। হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য যে, তিনি কোনোদিন মুখ ফুটে আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাননি, কিন্তু একমাত্র তিনিই শুধু আমাকে পরিত্যাগ করেননি।

ঝড়ের মতো সময় চলে যায়,—আমিও বড় হয়ে উঠি।

আমার দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে আমি মানুষ নই। আমার এই অদ্ভুত অস্তিত্বে সে ধারণা আরো দৃঢ়ভাবে আমার মনে স্থান পায়। এসব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমি অনুভব করি আমার মধ্যে মানুষের অনুভূতির স্পন্দন। সেই অনুভূতির সঙ্গে আমার মন কামনা করে অনেক কিছু। মন কামনা করে সুস্বাদু আহার পেতে, পরিষ্কার-পরিপাটি বেশভূষা পরতে, আরামপ্রদ নরম বিছানায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করতে, সুশ্রী ও সুন্দর ঘরের মধ্যে বাস করতে। আমি আপন মনে বলি: "এসব যে শুধু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, তোর এসব উপভোগ করবার সুযোগ শুধু স্বপ্ন মাত্র।" তা সত্ত্বেও, দোকানের জানালায় থরে থরে সাজানো লোভনীয় সামগ্রী দেখে আমি প্রলুব্ধ হই। শুধু কি তাই! নারীর কমনীয় কোমল দেহের স্পর্শ পেতে, তার বিম্বাধরের মিষ্ট হাসি দেখতে, তার ছোটো ছোটো শ্রীপদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তে আমার আকাঙ্ক্ষা হয়। তোমরা কি বিশ্বাস করবে আমার কথা? আমার মতো নগণ্য জীব তাদের স্পর্শ করবে, তাদের আদর করবে·····সত্যি বলছি বহুবার তাদের নিকটবর্তী হয়ে আমার উন্মত্ত বাসনাকে দমন করেছি এই বলে যে, আমার জন্মরহস্য সকলের অজ্ঞাত।

একদিন দেখি, দুটি সুঠাম সুকোমল শ্রীচরণ ঘিরে একটা সাদা ছোট্ট কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে আমার মন বললো: ঐ দেখ কেবল মানুষই সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে না, তোর মতো কুকুরও অনেক কিছু দাবি করতে পারে। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে আগ্রহ ভরে ছুটে যাই সেই দুটি শ্রীচরণ বুকে চেপে ধরতে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখি কে একজন আমার হাতটা ধরে আমাকে থামিয়ে দিয়ে, সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে!

চীৎকার করে লোকটা বলছে: "তুই কি পাগল?" এই বলে লোকটা আমাকে বেপরোয়া লাথি মারতে থাকে।

দেউলে ফিরে এসে, আমি তীব্র অনুশোচনায় মনে মনে স্থির করলাম আমি কুকুরেরও অধম। আমি কাতরভাবে বিগ্রহ দেবতার সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলাম: "হে দেবতা, হে আমার পিতা, তুমি আমাকে সত্যকার কুকুরে রূপান্তরিত কর,—সেই সাদা ছোট্ট কুকুর করে দাও, তা হলে আমি মানুষের যত্ন ও ভালবাসা পাব।"

৩

আর সব মানুষের মতো আমারও আকৃতি ছিল খর্ব, রং তামাটে, চুল কালো ও নাক চ্যাপটা। একদিন জানতে পারলাম এই দুনিয়ায় অন্য জাতেরও মানুষ আছে যাদের আকৃতি লম্বা, রং সাদা, চুল হলদে ও নাক উঁচু।

দেখলাম এরাই বুক ফুলিয়ে হল্লা করে হাসতে হাসতে রাস্তা মাতিয়ে পথ দিয়ে

চলেছে। দেখলেই মনে হয় তারা সজীব, তারা প্রাণবন্ত, পাশের লোকগুলো ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে চলেছে পাশ কাটিয়ে। সেদিন আমি আবিষ্কার করলাম যে মানুষের মধ্যেও বৈষম্য আছে। এতদিন যাদের দেখে এসেছিলাম, তাদের চেয়ে এরা উঁচু স্তরের লোক। বারবার করে এই উঁচু স্তরের লোকদের আমি দেখতে লাগলাম। দেখলাম তাদের মধ্যে অনেকেই মাথায় গোল সাদা ক্যাপ, নীল রংয়ের ঘের দেওয়া গায়ের জামা, আর পরনে সাদা পাতলুন। দেখি তারা সারাক্ষণ হাসছে, খেলছে, মারামারি করছে। কখনও দেখি তারা তামাটে রংয়ের লোকদের মাথায় বোতল আছড়ে ভাঙছে, নয়তো স্ত্রীলোক ধরে চুম্বন করছে, নয়তো স্ত্রীলোককে কোলে বসিয়ে রিক্সা করে চলেছে।

জনসাধারণ এদের খুব শ্রদ্ধা করে। সকলেই সসম্মানে তাদের জন্য পথ ছেড়ে এক পাশে দাঁড়ায়। মনে হয় দুনিয়ায় তারাই বুঝি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব। পারতপক্ষে আমি তাদের এড়িয়ে চলতাম, কারণ আমার উপস্থিতি তাদের উত্যক্ত করবে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন হয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে বসে আমার রক্তমাখা কাদাভরা পা-টায় হাত বোলাচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো লোক হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ তুলে চাইতেই তাদের দেখে ভয়ে আমার বুক ওর ওর করতে থাকে; জিব শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একি! শ্রেষ্ঠ মানবগুলো আমার সামনে। উপায়? পালিয়ে আত্মরক্ষার কোনো পথ না দেখতে পেয়ে, বোকার মতো বসে থাকি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। তারা চীৎকার করে আমাকে সেখান থেকে যেতে বলে। তারা আমায় লাথি মারতে মারতে বলে: "বেরিয়ে যা কুকুর!"

কুকুর? শুধু এই, তার চেয়ে বেশি কিছু বলেনি। সেদিন রাতে দেউলে গিয়ে বিগ্রহ দেবতাকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম এই সব উঁচু স্তরের লোকেরা আমাকে কুকুরের চেয়ে হীন মনে করে না। কুকুরের চেয়ে হীন জীব নই বলে যখন তারা আমায় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন নিশ্চয় কুকুরের অধিকার থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়লো সেই ছোট্ট সাদা কুকুরটির কথা, যে তার গৃহকর্ত্রীর শ্রীচরণের কাছে ছুটাছুটি করে বেড়ায়।

এর কিছুদিন পরে পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলাম কোমল পদপল্লব ফেলে ধীর ভঙ্গিমায় পথ দিয়ে চলেছে এক নারী। আত্মহারা হলাম। মনে পড়লো সাদা চামড়া লোকের দৃষ্টিতে আমি যখন কুকুর বলে সাব্যস্ত হয়েছি, তখন কেন আমি আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখি। সব কিছু ভুলে গিয়ে আমি আগ্রহভরে সেই ছুটি সুকোমল পদপ্রান্তে কাঁপিয়ে পড়লাম। মিশ্রিত জনকোলাহল ও মর্মান্তিক আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম। অবিশ্রান্ত বজ্রমুষ্টির আঘাত আমার উপর বর্ষিত হতে থাকে। শত সহস্র বাহুর টানা হেঁচড়ায় আমার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়। সে সময় আমার কোনো অনুভূতিই ছিল না, আমি শুধু উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রীচরণ ছুটি আগ্রহভরে বুকে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম।

জ্ঞান ফিরলে চেয়ে দেখি আমি একটা স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার কারাকক্ষে। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। আমার সারা দেহ বেদনায় জর্জরিত, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

ভাঙা দেউলের মাঝে আজও বসে আছেন যে বিগ্রহ দেবতা, জানি তিনি মহৎ, জানি তিনি ন্যায়বান, কিন্তু এ-জীবনে আমি আর কোনোদিন সেই শ্রীহীন দেবতার কাছে কিছু প্রার্থনা জানাবো না।

অনুবাদ: সূর্য পাল

পুস্তক-পরিচয়

১। **পঞ্চাশের পথ**—২। **ঊনপঞ্চাশী**—৩। **তেরশ পঞ্চাশ**—গোপাল হালদার প্রণীত। প্রকাশক পুঁথিঘর।

তিন খণ্ডে সমাপ্ত গোপাল হালদারের এই উপন্যাসখানি সাধারণ-শ্রেণীর উপন্যাস থেকে ভিন্নতর। ১৯৪২—১৯৪৩ অব্দের মন্বন্তর এর পটভূমি। এই দুই বছরের দুটি প্রধান, যুগান্তকারী ঘটনা হল ১৯৪২ অব্দের তথাকথিত কংগ্রেসী বিপ্লব ও ১৯৪৩ অব্দের সাংঘাতিক মন্বন্তর যাতে বাংলার প্রায় বিশ-ত্রিশ লক্ষ লোক উজাড় হয়। এর মধ্যে প্রধানত শেষেরটি অবলম্বন করেই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তিনটি খণ্ডের তিনটি ভূমিকায় গ্রন্থকার উপন্যাস রচনার মুখবন্ধ স্বরূপ বলেছেন যে, ইতিহাসের মর্যাদাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন; এর বর্ণিত ঘটনাবলীর তিনি নিজেই জীবিত সাক্ষ্য। তাঁর রচনায় ঘটনাই মহানায়ক, তবে চিত্র ও চরিত্র প্রতিফলিত করবার জন্য তিনি এমন এক লোককে বরণ করেছেন নায়কের পদে যে, শিক্ষিত বাঙলার কোনো মতামতের স্পর্শ আসেনি; অর্থাৎ পলিটিক্‌সে যে কতকটা নিরপেক্ষ। গোপালবাবু সুপরিচিত লেখক, বিশেষত কমিউনিস্ট-দলের মধ্যে। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা বাংলার বহু দৈনিক সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করেছে। কিন্তু উপন্যাস লেখা তাঁর এই প্রথম বললেই হয়। তবু ১০৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ উপন্যাসটিতে তিনি যে কৃতিত্বের ভাগী হয়েছেন তা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন না এটি আদ্যোপান্ত না পড়লে। আমাদের উপলক্ষ্য ছোট সমালোচনা, তা থেকে বইটির একটা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি লাভ হবে মাত্র।

নায়ক বিনয় মজুমদার ডাক্তার ও জাপান কর্তৃক বর্মাদখলের পর বর্মা-প্রত্যাগত। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে, নায়ক সাধারণ বাঙালী। তিনি কোনো বিশেষ দলের মতামত পোষণ করেন না, কিন্তু কংগ্রেসকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। দেশের জন্য কিছু কাজ করবেন, কিছু ত্যাগস্বীকার করবেন এটা হল তাঁর নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। নায়িকা সুধা গুপ্তা স্কুলটিচার ও রাজনৈতিক কর্মী; কমিউনিস্ট অমিতের শিষ্যা। সুধা গুপ্তার সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হয় অমিতের রোগশয্যাপার্শ্বে। বিনয় গিয়েছিল আপন গ্রাম সোনাকান্দিতে। সেখানে হুকুমজারি হয়েছে: 'জমি ছাড়াও, নৌকা কাড়ো'; এরই জন্য গ্রামবাসীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের ফিকিরে এইখানে কার্যসূত্রে এসে অমিত অসুস্থ হওয়ায় সহযোগী বীরু সেন সদ্যপ্রত্যাগত বিনয়কে ডেকে আনে। এই সূত্রে অমিতের সঙ্গে হয় আলাপ। অমিত বিনয়ের কাছে বর্মা ইভ্যাকুয়েশনের গল্প শোনে; বোমাবর্ষণের, ফিরতি পথের অশেষ লাঞ্ছনার কথা এমন কি বর্মীরা যে ভারতবাসীদের চায় না তাও শোনে। অমিতের শয্যাপার্শ্বেই সুধার সঙ্গে আলাপ। সুধার কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে চাঁপাডাঙায় যাবার, সেখানেও মানুষ সরানো হচ্ছে। এইখানে সুধার সঙ্গে কাজের সহযোগিতার অবসরে তার কর্মনিষ্ঠা, জ্ঞান, হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি ও

মানসিক দৃঢ়তা বিনয়ের মনে গভীর রেখাপাত ও প্রেম সঞ্চার করে। চাঁপাডাঙা যাবার আগে বিনয়ের রফা হয় সুধার সঙ্গে যে, বিনয় 'পলিটিক্‌স নেই', সুধা কিন্তু 'পলিটিক্‌স ছাড়া আর কিছুতে নেই'। বিনয়ের পরিচয় হয় বাংলাগ্রামের যুদ্ধকালীন সমস্যার সঙ্গে; একদিকে হতভম্ব নিঃস্ব অক্ষম চাষী ও গ্রামবাসী আর দিকে সর্বশক্তিময় মিলিটারি ও গভর্নমেণ্টের পদস্থ অফিসারবৃন্দ। এরই মধ্যে জাপানীদের আসন ছেড়ে দেবার আয়োজন। বিনয়ের বর্মার অভিজ্ঞতা সস্তা ও আপনলব্ধ, তার মতে জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর ঝগড়া নেই। অমিতদের মত হোক না জাপানী, কেন ইংরাজ প্রভুদের বেদখল স্থানে তাদের বসাব! তর্ক হয়, মীমাংসা হয় না। কলকাতায় আছে বিনয়ের ভগ্নী হেনা; শচীপ্রসাদ ভগ্নীপতি, ব্যবসায় সিদ্ধহস্ত! শচীপ্রসাদ বিনয়কে মন্ত্রণা দেয় একটা ডাক্তারী ওষুধ তৈরীর কারখানা স্থাপন করতে; বিনয় রাজী হয় তার টেক্‌নিক্যাল দিকটা দেখবার ভার নিতে। মিস্টার মিত্তির বড় সরকারি চাকরে, শচীপ্রসাদের বন্ধু। চিত্রা তাঁর বোন, কলেজের ছাত্রী। সে অতি সুসংযত, নম্র। এই নম্র সংযতবাক কৃশাঙ্গী নারীটিকেও বিনয়ের বড় ভাল লাগে। হেনার কাছ থেকে প্রস্তাব আসে ও অনেকবার বিনয়েরও মনে হয় যে সে ঠিক এই চায়: এই রকম সাধারণ নারীকে জীবনসঙ্গিনী করতে, যে হবে গৃহের গৃহিণী, শিশুর জননী। বিনয়ের সঙ্গে আলাপ হয় আরও অনেকের, ব্যবসায়ীদের, কংগ্রেস কর্মীদের—মেহ্‌রা, মথ্‌রাদাস, হরসুল রায়, ইব্রাহিম ভাই, ভদ্র ইত্যাদি। ড্রয়িং রুমে, পার্টি মিটিংএ নিমন্ত্রণ আসে। সুধাদের দল থেকেও আমন্ত্রণ আসে তাদের কাজে যোগ দেবার জন্য। বিনয় দেশে যায়, তার বাড়ি দখল হবে তারই ব্যবস্থা করতে। কিছু টাকাও পায় সে, আর আলাপ পরিচয় হয় নূতন নূতন লোকদের সঙ্গে—মজিদ, ইদ্রিস মিঞা, শাহেদ, জাহেদ, শিবুদা, মুকুন্দ পাল, বাঈ আম্মা, কীন সাহেব ইত্যাদি ও মিস্ সীতা রায়, হেডমিস্ট্রেস্। কেউ কমিউনিস্ট, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ উকিল, কেউ পুরাতন-পন্থী কেউ নূতন-পন্থী কংগ্রেস সেবক, কেউ লীগ মেম্বর, কেউ চোরা কারবারী। এই সময়ে কংগ্রেস ক্রীপস-মিশন আপোস ভেঙে যাবার খবর আসে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়া ও খেসারতের সমস্যা গ্রামে, অপর দিকে সারা দেশময় আগস্ট আন্দোলনের দুন্দুভি বেজে ওঠে। বিনয়ের মনেও উন্মাদনার আঁচ লাগে; সে ভাবে সুধাদের দল কেমন করে আজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; ক্ষেত শূন্য, গ্রামবাসী গৃহহারা, দিশাহারা, কাজ নেই, বাড়ি নেই, খাবার নেই, নৌকো নেই, দেশ শ্মশান—এই কি তথাকথিত "জনযুদ্ধ"? বিনয় আবার এসেছে কলকাতায়; মিলিটারির গুলিতে আহত নীরদকে নিয়ে। আবার সুধার ডাক আসে, বিনয়কে মিছিলে যোগ দিতে। আবার তর্ক হয়; সুধা বলে এ-জনশক্তির জাগরণ, এই যে গ্রাম-ছাড়ানো ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধতা, এই যে কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে গভর্নমেণ্টের আদেশ পরিবর্তন—এ সবই গভর্নমেণ্টের হার জনশক্তির কাছে। ক্ষুব্ধ হয় বিনয়—মানুষ খুন হয়, তাকে ভিটাবাড়ি নৌকো গাড়ি ছাড়তে হয়, সে কাপড় তেল কুইনিন পায় না, তবু যুদ্ধে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে হবে—এই কি জনশক্তির সংগঠন? বিনয় দেখে সহস্র লোকের মিছিল, রক্তপতাকা শত সহস্র, শোনে সহস্র কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনি; কমিউনিস্ট পার্টির আইনসঙ্গত হবার উৎসব। সে ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওদের কাজে লাগাবার জন্য এই দাক্ষিণ্য; কই ছেড়েছে কি গভর্নমেণ্ট চট্টগ্রাম বন্দীদের? না, না, সে এত বিমূঢ় ভ্রান্ত নয়। শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধীর ও সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার

সংবাদ প্রকাশিত হয়, সারা দেশবাসীর মুখে চোখে এক কথা খেলে যায়—"ডু অর ডাই," "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—তুমি কি করবে বিনয়?

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া; শচীপ্রসাদ, মেহ্‌রা, মথ্‌রাদাস ইত্যাদি সকলে অনেক আস্ফালন করেন সব রকম দিক থেকে সমস্ত কাজ বন্ধ করবার জন্য, কিন্তু তাতে মুনাফায় হাত পড়ার শঙ্কা, কিছুই হয় না। অসংবদ্ধ জনতা ট্রাম চালানো বন্ধ করে, তার কাটে, আগুন লাগায়, এসিড ঢেলে দেয় ট্রামযাত্রীদের ওপর। পুলিস মিলিটারি এসে বেপরোয়া গুলি করে, গ্রেপ্তার করে। কমিউনিস্টদলের ওপর সকলের সন্দেহ, ওরাই গুপ্তচরের কাজ করে বিপ্লব পণ্ড করে দিচ্ছে। চিত্রার বিষয়ে বিনয়ের মন পরিষ্কার হয়ে যায়, না সে তাকে বিবাহ করে স্বচ্ছন্দ গৃহীর জীবন চায় না, সে চায় কাজ করতে; মানুষের, সাধারণ মানুষের পথ করতে। সুধার কাছে সে আবার আসে কিন্তু সেবারেও সুধার কাছে তার প্রণয় নিবেদন ব্যাহত হয়। ফিরে আসে সে দেশে, সেখানে দেশের নানা সমস্যায় ও পীড়িতের চিকিৎসায় সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করে। সহজ আনন্দ ও সৌহার্দ্যের ঔদার্য নিয়ে হাস্যময়ী সীতা বিনয়কে সকল কাজে উৎসাহিত করে। এখানকার রাজনৈতিক কর্মী—প্রমথ, মজিদ, শিবুদা প্রভৃতির প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা কংগ্রেস-কর্মীদের চেয়ে কম নয়। বিনয় ভাবে ওরা কমিউনিস্ট হতে গেল কেন; তাদের সঙ্গেও হয় তর্কযুদ্ধ। এদিকে তার প্রতি প্রমথর যেন এক তির্যক মনোভাবও সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে; সে কি সীতার জন্য?

"রেশন প্রবর্তিত কর"—রব ওঠে কমিউনিস্টদের তরফ থেকে। কেরোসিনের রেশন শুরু হয়; বিনয়কে তদারকের ভার নিতে হয়, কিন্তু লোভ ও চোরাকারবারের তাগিদে রেশন সুব্যবস্থা পণ্ড হয়। গ্রামে গ্রামে চাল কেনা শুরু হয়। চাল যাবে কলকাতায়, বিদেশের জন্য, যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য রপ্তানি হতে। ইব্রাহিমভাইর চররা চারিদিক থেকে চাল কিনে চালান দেয়; মেদিনীপুরের ঝঞ্ঝা-প্লাবন এই সময়ে সমস্যা আরও ঘনীভূত করে তোলে। আবার আসে সুধার ডাক—মেদিনীপুরের কাজের তলব। বিহ্বলচিত্ত বিনয় ছুটে আসে কলকাতায়। স্থির হয় বিনয়ের বর্মার পরিচিত গণ্যমান্য অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে হবে। রেঙুনের এ্যাডভোকেট মিঃ চ্যাটার্জির কাছে যাবার পথে সুধার কাছে বিনয়ের আত্মনিবেদন প্রগাঢ় ঐকান্তিক হয়ে ওঠে; বিনয় যেন সুধার সাড়া পায় ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে চাটুয্যে সাহেবের কাছে সুধার পরিচয় করিয়ে দেয় "মাই ফিয়াসে" বলে। সুধার মুখের উপর রক্তিম ছটা সম্মতি জানায়। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ অন্যরকম। কলকাতায় বোমা পড়ে, জনশূন্য প্রায় হয়ে যায় কলকাতা—লোক পালায়। সুধারা চায় এর প্রতিরোধ, বিনয় বর্মার অভিজ্ঞতাবশে চায় চলে যাক্ লোক, বাঁচুক মানুষ। মত-পার্থক্য উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে। বিনয় ফিরে যায় দেশে।

দেশে এসে বিনয়ের যে অভিজ্ঞতা হয় কালের অতি দ্রুত চক্রপরিবর্তনের তা এক অদ্ভুত আবিলময় অভিজ্ঞতা। গ্রামে, হাটে, দোকানে, চালের ক্রমশ দাম বৃদ্ধি,—এমন কি দুষ্প্রাপ্যতা; এদিকে চালের চালান কলকাতায়, গভর্নমেণ্ট কর্তৃক চাল কেনার এজেণ্ট নিয়োগ, কলকাতা ছাড়া অন্যত্র সংগৃহীত চাল রাখা নিষেধ—এ সবের ফলে উত্তরোত্তর গ্রামে গ্রামে চালের অভাব, বিরাট চোরা কারবারের জাল, রাজনৈতিক দল ও তাদের লীডারদের দলাদলি। অবশেষে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ যার সাক্ষাৎ পরিচয় সকল বাঙালীই

পেয়েছেন। কাপড়, তেল, কয়লা, এমন কি, কাগজের দুর্ভিক্ষ ও চোরাকারবার। আর একদিকে জেলাবোর্ড কাউন্সিলের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতির গ্রন্থি। শ্যামাপ্রসাদ-ফজলুল হক-সোহ্‌রাবর্দির রিষ ও মিতালি আবার চালের কারবারের প্রসাদে মারোয়াড়ী-বাঙালী-ভাটিয়া যেমন, খোজা ফজলভাই ইব্রাহিম ভাই—তথা লীগ-কংগ্রেস-মহাসভার ইউনিট। কলকাতায় দুর্ভিক্ষের করাল রূপ, নঙ্গরখানা, নাজিমুদ্দিন-সোহ্‌রাবর্দির পুরাতন ও নূতন মন্ত্রীদের ঘুঁটির চাল। সোনাকান্দিতে জাপানী বোমাবর্ষণ, সেবা সমিতি, মেয়েস্কুলের অচল অবস্থা, সীতার নীরবে হাস্যমুখে দুর্ভোগ বরণ। স্কুলের প্রেসিডেন্ট বৈকুণ্ঠবাবুর সীতার প্রতি কৃপা দৃষ্টি এবং তাকে নির্যাতন, শাসনের ভয় প্রদর্শন। বীরু সেনের পত্নী ও শ্যালিকা সমস্যা; ইদ্রিস মিঞার কন্যা ও জামাই ঘটিত সমস্যা। শিবুদার অ্যারেস্ট ও বিচার, পরে অসুখ ও মৃত্যু। শচীপ্রসাদের চোরা কারবার ও প্রকৃষ্ট ওষুধের নামে ভেজাল চালানোর প্রচেষ্টা, হেনার শিশুকন্যার মৃত্যু, বোধ হয় ভেজাল ওষুধের কল্যাণে। সুধার সঙ্গে বিনয়ের পুনরায় আলাপ আলোচনা ও তজ্জনিত আশা ও নিরাশা। সীতার প্রহেলিকা—সকলকে ছাপিয়ে ক্ষুধার ক্রন্দন 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' রব, সেই সঙ্গে অনাহারী দলের নিরুদ্দেশ যাত্রা, ক্ষুধিত রমণীর আত্মবিক্রয়; ছবির পর ছবি বিনয়ের সামনে রূপায়িত ও রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল বিনয় দেখে, প্রমথ পার্টির কাজ ত্যাগ করে ব্যবসায়ে লিপ্ত, প্রমথই সীতার প্রণয় দেবতা; তাকেই সীতা বিবাহ করে। আর ওদিকে সে চিনতে পারে যে পার্টির কাজই সুধার ইষ্টদেবতা; তার বিভ্রম যায় দূরে। সে সুধার প্রতি যেমন এক শ্রদ্ধা তেমনি "সাধারণ মানুষের কাজে" এক মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

আগেই আমরা বলেছি লেখকের এই বই তিনটি সাধারণ-শ্রেণীর উপন্যাস থেকে একটু ভিন্ন। আমরা এখানে এই প্রভেদের লক্ষণ নির্দেশের প্রয়াস করব। নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও প্রেমের বিকাশ,পার্শ্বচরিত্র, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক, লৌকিক বা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সমাবেশ, এগুলির মধ্যে যোগাযোগ ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতির চরিতার্থতা প্রদর্শন হল সাধারণত উপন্যাসের লক্ষ্য। কিন্তু বিপ্লবী যুগের উপন্যাস সাধারণ-শ্রেণীর উপন্যাস থেকে হয় ভিন্ন। এর কারণ শান্তিময় যুগে অন্তর্লৌকিক শক্তি মন্দীভূত তেজে কাজ করে, সামাজিক পরিবর্তন ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিপ্লবীযুগে এসব শক্তি ও পরিবর্তন প্রচণ্ড ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অনেক জিনিস যা ছিল নির্জীব, হয়ে ওঠে জাগ্রত আর ঘটনা সংক্রামিত হয় একদিক থেকে অন্যদিকে বা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিদ্যুৎবেগে। বহু মানবীয় যোগসূত্রে এ সময় টানও পড়ে আবার দৃঢ়তাও আসে। এ সময়ের কথাচিত্র সার্থক হয়, যদি তা বহুমানবীয় যোগসূত্র, বিভিন্নস্তরের আলোড়ন ও পরিবর্তনের শীঘ্রগতি প্রতিফলিত করতে পারে। আমাদের বর্তমান যুগকে বিপ্লবী যুগ বললে বোধ করি অন্যায় হবে না। আমাদের যত কিছু ব্যবস্থা ও সংস্কার—ধর্ম অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বর্তমানে বিপ্লবের সম্মুখীন। আর একদিন এসেছিল একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবের দিন, বঙ্গবিচ্ছেদের যুগে। সে সময় হয়েছিল আমাদের প্রথম জাগরণ। "গোরা"য় সেই জাগরণের আকৃতি স্বরূপ লাভ করেছিল; যদিও "গোরা" প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবেষ্টনীতেই আবদ্ধ। বর্তমানে বিপ্লবপন্থী যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে গোপালবাবুর বই তাদের মধ্যে একটা বৃহৎ উৎকর্ষ লাভ করেছে। বহু মানবীয় যে-যোগসূত্রের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি সে-

যোগসূত্রের সন্ধান দিতে গোপালবাবু ত্রুটি করেননি। পঞ্চাশটির ওপর চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এ উপন্যাসে, নিতান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের বা রকমারির তাগিদে তারা উপস্থাপিত হয়নি। তারা আসন করে নিয়েছে নিজেদের জন্য উপন্যাসটিতে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কংগ্রেসসেবী, লীগসেবী, কমিউনিস্ট, চাষী, মজুর, উকিল, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, গভর্নমেণ্টের চাকুরে, গ্রাম্য কন্ট্রাকটর, আই. সি. এস, চোরাকারবারী, সাধারণ গ্রামবাসী, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বোমাহত, ক্ষুধায় জর্জরিত আত্মবিক্রয়ী রমণী—উপন্যাসটির আসরে এরা সকলে স্বস্থানে উপস্থিত। সামাজিক নানা বিভাগ নানা শ্রেণী ও নানা স্তরের যোগাযোগ, তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রভাব ও গ্রন্থের চরিত্রগুলির সঙ্গে এই সবের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। উচ্চস্তর নিম্নস্তরের মধ্যে কেমন ভাবে বিলীন হয়ে আছে, গ্রাম কেমন করে শহরকে শিল্প-বাণিজ্যে শোষণ করছে ও শহর কি ভাবে গ্রামকে সবল করে তার সন্ধান আছে এ গ্রন্থে। শহরের নানা কূট-কৌশল আবার গ্রামের দুঃখকষ্টের সঙ্গে ঈর্ষা-আত্মকলহ সেই সঙ্গে সংঘবদ্ধতা ও কর্তব্যপরায়ণতা অবয়ব লাভ করেছে। এ সবের সুষ্ঠু পরিবেশনে যদি বিপ্লবী উপন্যাস সার্থক হয় তবে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে গোপালবাবুর বই সার্থক হয়েছে।

তবু আমাদের যেটুকু নালিশ আছে সেটুকুর এইখানে উল্লেখ করব। নায়ক-নায়িকা ও প্রধান চরিত্রগুলি গ্রন্থের মধ্যে মানসিক কোনো গূঢ় পরিবর্তন উত্থাপন করতে পারেনি। এ রকম পরিবর্তনই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। মাংস অস্থি ত্বক ইন্দ্রিয় সবই উপস্থিত, শুধু প্রয়োজন কোনো এক মন্ত্রবলে তাতে প্রাণ সম্পাদন করা; সেই প্রাণ সম্পাদনে কোথায় যেন ব্যর্থতা আছে। বিনয় প্রবহমান স্রোতে ভেসে চলেছে কিন্তু তার চিত্ত দ্রাবক থেকে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। নায়িকা সম্বন্ধেও একথা খাটে। আর একটা জিনিস আমরা দেখব আশা করেছিলাম কিন্তু খুঁজে পাইনি, সামাজিক ও লৌকিক কোনো বিভাগে কোনো চিরপ্রথাগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তুলে ওঠেনি—পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের লেখা "গোরা"তেও সে বিদ্রোহের সুর কত সুতীব্র।

লেখকের ভাষা নিজস্ব, প্রাঞ্জল, কিন্তু কোথাও কোথাও একটু খিঁচ লাগে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

রিক্সাওয়ালা—লাও চাঅ। অনুবাদক: অশোক গুহ। অগ্রণী বুক ক্লাব। দাম চার টাকা।

প্রবাহ—টিয়েন চান। অনুবাদক: অশোক গুহ। পূরবী পাবলিশার্স। দাম দু'টাকা বারো আনা।

চীনের সাহিত্য আজ এগিয়ে চলেছে। চীনের আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগে সাহিত্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র সম্প্রদায়ের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় যুগে সাহিত্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তৃতীয় যুগে, অর্থাৎ বর্তমান যুগে চীনের সাহিত্য বিস্তৃত হয়ে পড়লো চীনের জনগণের মধ্যে এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জনগণের জীবন-যাত্রার দিকে। তাই আমরা পেলাম চীনের গোর্কি "লু-সুন"-এর অমরকীর্তি "না-হান", "মাও-তুন"-এর "মিডনাইট", "লাও চাঅ"এর "ইয়াং ছে ফু" (রিক্সাওয়ালা), "টিয়েন-চান"-এর "ভিলেজ ইন অগাস্ট" (প্রবাহ) প্রভৃতি।

"লাও চাঅ"-র "রিক্সাওয়ালা" নতুন ধরনের উপন্যাস, নাম শুনেই বুঝা যায় বইখানার বিষয়বস্তু কি, যেমন বোঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি"র নাম শুনে।

গ্রাম্য যুবক খুশি এলো পিকিং শহরে জীবিকা উপার্জন করতে—উদ্দেশ্য স্বাধীন রিক্সাওয়ালা হবে। তিন বছর ভাড়াটে রিক্সা টেনে একদিন সে কিনলো নিজের রিক্সা, কিন্তু সে রিক্সা তার হারাতে হলো। আবার রিক্সা কেনার জন্য "খুশি" আরম্ভ করলো মাস মাহিনায় রিক্সা টানতে। এ সময়েই "মানবমিলন রিক্সা আস্তানা"র মালিকের মেয়ে বাঘিনীর খপ্পরে তাকে পড়তে হলো—ছলে-বলে-কৌশলে বাঘিনী-ই "খুশিকে" বিয়ে করলো। বাঘিনীর টাকায় আবার তার নিজের রিক্সা হলো কিন্তু বাঘিনীর অত্যাচারে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই মৃত সন্তান প্রসব করে বাঘিনী শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। আর "খুশিও" মুক্তি পেল রিক্সাখানাকে বিক্রি করে দিয়ে। কিন্তু নতুন বন্ধন এলো বস্তির মেয়ে "ক্ষুদে লক্ষ্মীর" রূপ নিয়ে। অবশ্য সাময়িকভাবে সে বন্ধন কাটিয়ে "খুশি" শুরু করলো রিক্সা টানা। কিন্তু স্বাধীন রিক্সাওয়ালা আর সে হতে পারলো না—সে হলো একজন সাধারণ রিক্সাওয়ালা—সেই মদ, সেই "সাদাবাড়িতে" যাতায়াত, দেহে যৌনব্যাধির বিষ ঢোকানো, কিছুই আর বাকী রইল না। শেষে নতুন বন্ধনের কাছে সে আত্মসমর্পন করলো—"ক্ষুদে লক্ষ্মী"কে খুঁজে বার করলো গণিকালয় থেকে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে রিক্সাওয়ালার কাহিনী।

সমাজের নিচের তলার মানুষের জীবন-কাহিনী, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখকষ্ট, জীবনের দুর্গমপথে ঘাত-প্রতিঘাত—সমস্তই "লাও-চাঅ"-র লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রিক্সাওয়ালার জীবনযাত্রা যে কি রকম, তাদের সুখ দুঃখ, তাদের জীবনসংগ্রাম—সব কিছুই আমরা পাই "খুশি"র জীবন-কাহিনীতে। শত চেষ্টা করেও স্বাধীন রিক্সাওয়ালা "খুশি" হতে পারলো না। সাধারণ রিক্সাওয়ালা থেকে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারলো না। ধনতন্ত্রী সমাজের শোষণযন্ত্রের পাকে সে গুঁড়িয়ে গেলো—তাকে হতে হলো একজন সাধারণ রিক্সাওয়ালা।

চীন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান পার্ল বাক আর লিনয়ুটাঙের মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। "লাও চাঅ" মধ্যশ্রেণীর জীবনচিত্র আঁকতে বসেননি, তিনি এঁকেছেন নিম্নশ্রেণীর বাস্তব জীবনের ছবি—সে জীবনের প্রতি ছত্রে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে, ব্যক্ত হয়েছে প্রাণের দরদ। "খুশি"র কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন চীনের অত্যাচারিত জনমানবের কাহিনী—কি অদ্ভুত তাদের জীবন যাত্রা! জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন প্রতিমুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোথাও আলোর রেখা নেই—চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার! এইখানেই বইখানার ত্রুটি। লেখক জনগণের পাঁচালি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মুক্তির সন্ধান দিতে পারেননি—ধনতন্ত্রী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর কোথাও ধ্বনিত হয়নি। অথচ চীনের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যদিও "খুশি" একদিন শুনেছিল এই বিদ্রোহের সুর তার সোয়ারী ছিঙহুয়ার ছাত্রীর মুখ থেকে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর যখন দুজন সঙ্গীর সঙ্গে সেই ছাত্রীকে বেঁধে ট্রাকে করে রাস্তা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ছাত্রীটাকে দেখে "খুশি"র মনে পড়েছিল তার মুখের সেই কথাগুলো। কিন্তু রাস্তার

দুধারে ভীড়করা জনগণ—বিশেষ করে নিচের তলার মানুষেরা—যাদের জন্যই ওরা উড়িয়েছিল বিদ্রোহের ধ্বজা, তারা বাহবা দিচ্ছিল পুলিসের কাজে। বলছিলো—"চমৎকার"। এ ব্যাপারটা পাঠকের রাজনৈতিক চিন্তাজগতে সংশয় জাগায়। সত্যই কি চীনের জনসাধারণ সেদিন এত অজ্ঞ এত মূর্খ ছিল!

এক কথায় "রিক্সাওয়ালা"য় আছে চীনের নিপীড়িত জনগণের কাহিনী, নাই তাদের মুক্তি-কামনা—তা আছে "টিয়েন চান"-এর "প্রবাহে"। সেখানে দেখি অন্য চিত্র—চাষী মজুরের জীবনে আলোর রেখা, দেশোদ্ধারের জন্য দুর্জয় সংকল্প।

"প্রবাহে"র কাহিনী হচ্ছে মাঞ্চুরিয়ার চাষী-মজুরের জাপ-বিরোধী গেরিলা বাহিনীর কাহিনী। ১৯৩১ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুরু হয় জাপানের মাঞ্চুরিয়া-অভিযান—ফলে মাঞ্চুরিয়ায় ওড়ে নিশ্ননি নিশান। সেই থেকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে আরম্ভ হয় চীনের চাষী-মজুরের জাপ-বিরোধী অভিযান। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য চাষী-মজুরেরা গ্রহণ করলো গেরিলা রণকৌশল। এমনিতর একটি গেরিলা বাহিনীর ইতিবৃত্ত নিয়েই "প্রবাহ" রচিত।

জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের চাষী মজুর নিয়ে গড়ে উঠলো গেরিলা বাহিনী। গ্রামের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে তাদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছে—'সান্'ভাইদের 'চেন চু'র বাহিনীতে যোগদানই তার প্রমাণ। চাষী "পিয়েনে"র বুকে কি অদ্ভুত আলোড়ন! তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে—জাপানীদের বিরুদ্ধে সে লড়বেই, কিন্তু সে-পথে তার প্রধান প্রতিবন্ধক তার যুবতী ভার্যা আর ছোট্ট দুটি শিশু সন্তান। তবু মন চাইছে রাইফেল নিয়ে ছুটে যেতে।

গেরিলা বাহিনীতে যারা এসেছে তাদের মধ্যে মজুরেরাই বেশি সচেতন। তাই সেনাবাসের লালঝাণ্ডা দেখে তাদের চোখ গর্বে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, টুপি খুলে তারা অভিবাদন জানায়। "বয়েল তাঙ"-এর মতন চাষীরা অবাক হয়ে ভাবে লালঝাণ্ডা দেখে ওসব সাথীরা অত খুশি হয়ে উঠে কেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও বোঝে তাদের জীবনে "লাল নিশান" কি।

গ্রামে শহরে গেরিলা বাহিনী পায় সাদর অভ্যর্থনা। পাহাড় থেকে নেমে "সিয়াওমিঙে"র দল গ্রামে এসে যে বাড়িতে ঢুকলো সে বাড়িতে ছিলো এক বুড়ো আর তার নাতি। সম্বল তাদের চাট্টি চাল কিন্তু তাও তারা দিয়ে দিল বাহিনীকে। নাতিটির "সিয়াও কাকা" ডাক শুনেই বুড়ো বুঝলো ওরা কারা। তার ছেলেও ছিল ওদেরই দলে—জাপানীদের হাতে সে-ছেলে ও ছেলে-বৌ নিহত হয়। গ্রামের অভ্যর্থনা আন্তরিকতায় ভরপুর। কিন্তু শহরের অভ্যর্থনা কৃত্রিমতা মাখানো। তার দৃষ্টান্ত দেখি "চেনচুর বাহিনী" যখন একটি শহরে এসে পৌছালো—শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের অভ্যর্থনা করলো যেমন করে তারা অভ্যর্থনা করে ডাকাতদলকে বা জাপ-বাহিনীকে।

"চেনচু"র বাহিনীর সৈনিকেরা সাধারণ মানুষ—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ভিতর থাকা স্বাভাবিক। তাই "খুদে লালমুখ" পাইপ মুখে দিয়ে ভাবছে—স্ত্রী, সন্তান, গোলাবাড়ি থেকে গেরিলাবাহিনীর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ কি খুব বড়ো! আর বিপ্লব কবে সার্থক হবে,

করে বাড়িঘর ফিরে পাওয়া যাবে। "বড় লিউ"র মনে দোলা দিচ্ছে—বিপ্লব কি শীঘ্রই আসবে এবং এলে তার ভবিষ্যৎ কি! "বয়েল তাঙ" ভুলে যায়নি তার প্রেমিকা "সপ্তমবোন লি"কে—বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙেও সে ছুটে গেল সপ্তমবোনের সন্ধানে। "লোউ-ঈগল" বজ্রের মত কঠিন, কোথাও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু সপ্তমবোন আর ফেঙের মৃত্যু সংবাদ দিতে তার স্বর হল মৃদু, "অথচ চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস নেই।" সিয়াও মিঙ একটি দলের নেতা হয়েও প্রণয়ী "আনার"বিচ্ছেদের ভার সহ্য করতে পারলো না—সে হারিয়ে ফেললো তার নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা, কিন্তু কমরেডদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সে দ্বিধা করলো না!

আর আনা! কোরিয়ার বিপ্লবী মেয়ে সে, গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে সে রয়েছে শুরু থেকে। তার পুষ্পিত যৌবনের দুয়ারে এসে উপস্থিত হলো সিয়াওমিঙ—আনা নিজেকে বিলিয়ে দিলে। বিপ্লবের প্রতি তার অবিচলিত শ্রদ্ধা ব্যক্ত করার পরও বিচ্ছেদ বেদনায় সে কাতর হয়ে পড়লো—'চেনচু'র কাছে সে অনুমতি চাইলো বাহিনী ত্যাগ করার। "চেনচু" তাকে বিপ্লবের পথে প্রাণবন্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো—পরাজিতা আনা বাহিনী ত্যাগ করলো না অবিশ্যি, কিন্তু সে সজীবতা আর সে ফিরে পেল না।

এদিক থেকে 'সপ্তমবোন লি' অনেক শক্ত। বিপ্লবের ধারায় সে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু তাঙের প্রতি তার গভীর প্রেম, দেশের প্রতি তার ভালবাসা তাকে নিয়ে এল তাঙের কমরেডদের বাহিনীতে। শৃঙ্খলা ভেঙে তাঙ যখন তার উদ্ধারের জন্য এসেছে, তখন সে তাকে ভর্ৎসনা করেছে, ফিরে যেতে বলেছে বাহিনীতে। তারপর খোকন আর তাঙকে হারিয়ে তাঙের রাইফেল নিয়েই সে এসে যোগ দিল গেরিলা বাহিনীতে। মাথা তার পাক খাচ্ছে—"নেই সন্তান, নেই প্রেমিক, আছে রাইফেল।" লেখকের শব্দে সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, সত্যি এ "কেমন মেয়ে?"

সেনাপতি চেনচু একদিকে কেমন কঠিন, আর একদিকে তেমনি কোমল—তার সামনে উড়ছে "লাল নিশান।" তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। 'আনা'র জন্য হয়ত তার ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সিয়াও আর আনার প্রণয়ের ব্যাপার জানার পর সে নিজেকে সংযত করে নিল। অবশ্য আনাও সিয়াওকে সাময়িকভাবে সে পৃথক করে দিল কর্তব্যের খাতিরে, কিন্তু আনাকে সেই রক্ষা করলো বিপ্লবীবাহিনী ত্যাগ করার পথ থেকে। বাহিনীর শৃঙ্খলার দিক থেকে সে ছিল খুব কড়া—যেটা গেরিলা বাহিনীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। গ্রামে প্রবেশ করে সেজকর্তা ওয়াঙ ও তার স্ত্রীকে গুলি করে মারবার হুকুম দিতে সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু আহত কমরেডদের প্রতি দরদ ও দৃষ্টি, নিহত কমরেডদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণ তার হৃদয়ের কোমলতার দিকটাই দেখিয়ে দেয়।

আবার দেখি জাপ-ছাত্রসৈনিক "সে-কি" অন্যান্য সৈনিকের মতন মেয়ে শিকারে বেরিয়েছে। তার মনে পড়ছে জাপানে তার প্রেমিকা "আকি হায়ামার" কথা—"যুদ্ধে যাচ্ছ যাও, কিন্তু চীনে মেয়েদের দিকে নজর দিও না।" "সে-কি", ওর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য মেয়েদের আর কি হতে পারে। কিন্তু "সে-কি" তো আর সে "সে-কি" নেই—জাপ সমরযন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ সে, সম্রাটের প্রতি রয়েছে তার মহান কর্তব্য। আর "আকি হায়ামা" তো সোশালিস্ট, বিদ্রোহিনী! তাই অন্যান্য সৈনিকের মতন খোকনকে হত্যা করে

"সে-কি" করলো সপ্তমবোন লির সর্বনাশ—"আকির" শেষ কথা ডুবে গেল বিস্মৃতির গহ্বরে।

"টিয়েন চান"-এর কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় চলচ্চিত্রের মত সমস্ত দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছেঃ ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাসের পাতাতেই আমরা এ কাহিনী পাই (এপস্টাইন, এডগার স্নো প্রভৃতির লেখায়)। স্বদেশ মাঞ্চুরিয়া হারিয়ে টিয়েন চান নিজেই গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন—তাই তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে একখানা বাস্তব ছবি, ধ্বনিত হয়েছে প্রতিরোধ-সংগ্রামের সুর।

এখানেই "রিক্সাওয়ালা"র সঙ্গে "প্রবাহের" পার্থক্য। "রিক্সাওয়ালা"য় অত্যাচারিত জনগণের কাহিনী আছে, কিন্তু মুক্তি-কামনার জন্য কোনো আগ্রহ নেই। অথচ তৎকালীন চীনের শহরে শহরে কমিউনিস্ট যুবকেরা রিক্সা ভাড়া করে টেনে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে মিশে লালঝাণ্ডার ইউনিয়ন গড়েছে। কিন্তু "লাও চাঙ"-র রিক্সাওয়ালার জীবন-কাহিনীর ভেতর তার কোনো সন্ধান নেই, যদিও তা সমসাময়িক ঘটনা। কিন্তু "প্রবাহে" ফুটে উঠেছে সাময়িক উত্তরচীনের দেশরক্ষায় উদ্বুদ্ধ চাষী মজুরের জীবন্ত কাহিনী।

ইভান কিং এ বই দু'খানি চীনা ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত অশোক গুহ এ দু'খানি বাংলা অনুবাদ করে পাঠক-পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন। অনুবাদে অশোকবাবুর হাত পাকা, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু এ বই দু'খানিতে "বেমক্কা," "জেল্লা," "পিলপেগাড়ি," "ফনফনিয়ে" "ম'-ম' করছে" প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দের প্রয়োগ পাঠকের মনে খট্‌কা জাগায়। হয়ত ইংরেজী বইএর ভাষার নিজস্ব ভঙ্গীটি রাখবার জন্যই অশোকবাবু ওগুলো ব্যবহার করেছেন। তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বই দু'খানার বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি কোথাও বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হবার পথে জড়িয়ে যায়নি। এখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব।

সুধাংশু দাশগুপ্ত

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি ঃ এ. লিয়নটিয়েভ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি যে শেখা দরকার এ বিষয়ে ১৯৪৬ সনে কোনো কিছু বলার খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কেউ শিখতে চান সত্যানুসন্ধানের জন্য, কেউ শিখতে চান নিছক কৌতূহলের বশে—দেখা যাক্, মার্ক্‌স্ লোকটারই বা কি বলবার আছে! আবার আর এক দল লোক আছেন যাঁরা মার্ক্‌স্ পড়েন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমর্থনের জন্য কী-কী নূতন যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে মার্ক্‌সীয় মতবাদ খণ্ডন করা যায় সেটা উদ্ভাবন করার জন্য। এই তৃতীয় দলে আছেন পুঁজিবাদের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সমর্থক বহু দার্শনিক ও ধনবিজ্ঞানী পণ্ডিত। গত ষাট সত্তর বছরের মধ্যে পুঁজিবাদী ধনবৈজ্ঞানিকগণ পুঁজিতন্ত্রের যে সব নূতন থিওরি ও ব্যাখ্যা উদ্ভাবন ক'রেছেন তার প্রত্যেকটার মধ্যেই দেখা যায় মার্ক্‌সীয় মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা। কেউ বা সরাসরি মার্ক্‌সের নাম উল্লেখ করেন, কেউ বা সযত্নে মার্ক্‌সের নাম পরিহার ক'রে চলেন যেন নামটা তাঁদের কাছে টাবু। এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে

মার্কসীয় মতবাদ পুঁজিতন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়েছে একটা যুধ্যমান রূপ ও ভঙ্গীতে। মার্কসের অর্থনীতি একটা চালেঞ্জ, পুঁজিতন্ত্র সংহার করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে প্রধান বৈজ্ঞানিক অস্ত্র। এই অস্ত্রকে ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাদী পণ্ডিত সমাজের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। তাই মার্কসের তথাকথিত ব্যাখ্যা, উপব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যায় সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রথম বার্ষিক-শ্রেণীর ছাত্র ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছে মার্কসের labour theory of value ভুল, surplus value বলে কিছু নেই। আর একটু অগ্রসর হলে ছাত্ররা শেখে factor of production দুটো নয় চারটে এবং চারটেই বা কেন হয়তো বা চারশটি। Rent, interest ও profit এই তিনটের পিছনেই real cost আছে, আর এই real cost-টা সব রকম reality হারিয়ে পর্যবসিত হয়েছে utility in alternative uses এই অত্যন্ত unreal কল্পনায়; cost ও utility এক হয়ে গেছে। Demand ও supply মূল্য নির্ণয় করে—এই অতি তুচ্ছ ও ষোল আনা empirical theory-টাই marginal opportunity cost, marginal substitutability, ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে modern theory of values রূপে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। মার্কসকে চালু করা হচ্ছে under-consumptionist রূপে। শেখানো হচ্ছে, rent, interest, profits ও wages হিসাবে যে আয়টা সমাজের দেহে অনুপ্রবিষ্ট করা হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হলেই পুনরায় ওই আয়টাই সঞ্চালিত হবে; এই স্বতঃসিদ্ধ truism-টাকে ঢাক পিটিয়ে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে প্রচারিত করা হচ্ছে। কেন সমাজের বাজেটে আয়-ব্যয়ের বৈষম্য হয় তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না ক'রে নানারূপ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো উদ্ভট উপায় কল্পিত হচ্ছে।

মার্কসের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে নানা দল আছে। যাঁরা প্রকাশ্যে Big Capital-এর স্তুতি করেন এঁদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে এবং গলাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই গণজাগরণের যুগে ও পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সোশালিস্ট রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির যুগে পুঁজিতন্ত্র নানারকম সূক্ষ্ম defence mechanism রচিত করছে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পুঁজিতন্ত্রের সমর্থকগণ তাই আজকাল সবাই সোশালিস্ট। কেউ বলছেন সোশালিজ্‌ম্‌টা গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে ক্রেতাদের কপোলকল্পিত গণতন্ত্র আছে (পাঠক নিজের শূন্য পকেট ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভের দিকে তাকালেই এই গণতন্ত্রের মহিমাটা উপলব্ধি করতে পারবেন), অতএব পুঁজিতান্ত্রিক সমাজটাই আসলে সোশালিস্ট। কেউ বলছেন সোশালিজম-এর অর্থ প্ল্যানিং এবং প্ল্যানিং-এর অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। পুঁজিতন্ত্রের সামান্য একটু-আধটু যা গলদ আছে সেগুলো দূর ক'রে পুঁজিতন্ত্রের শুদ্ধি করার জন্য। কখনও বা শুনি, ওই দূরে যে সব জনগণের কথা বারবার শুনতে পাওয়া যায় তাদের প্রাসাচ্ছাদনের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধার নেতারা যদি প্ল্যান করতে থাকতো তাহলে কোনো থিওরির প্রয়োজন হবে না, প্ল্যান করতে করতে আপনিই সোশালিজ্‌ম্‌ এসে পড়বে। আবার যাঁরা কপালে বামপন্থীর টিকিট মেরে বেড়ান তাঁরা সবাই "প্রকৃত" ও "খাঁটি" মার্কসিস্ট। এই "খাঁটি" মার্কসিস্টদের মতবাদের কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে মার্কসকে আবিষ্কার করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মার্কসীয় মতবাদের চ্যালেঞ্জ পরাভূত করার জন্য পুঁজিতন্ত্র যে উপবৈজ্ঞানিক ধূম্রজাল

বিস্তার করেছে তা ভেদ ক'রে সত্যের আবিষ্কার করা সহজ নয়। অথচ তা করতেই হবে। কি আভ্যন্তরীন নিয়মে পুঁজিতন্ত্র চলমান সেটা আবিষ্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। পুঁজিতন্ত্র আকাশ থেকে পড়েনি। কি নিয়মে সে পূর্বতন সমাজের জঠর থেকে উদ্ভূত হোলো এবং কি নিয়মেই বা সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে;—এই কার্যকারণ সম্বন্ধের নির্ণয় করা সহজ নয়। কোনো বিজ্ঞান ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শিক্ষা করানো যায় না। মার্কসীয় অর্থনীতি তো নয়ই। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য মার্কসের নিজের লেখা পাঠ করা। কিন্তু "ক্যাপিটাল"-এর মতো বিরাট ও কঠিন গ্রন্থ পাঠ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। Value, Price and Profit এবং Wage Labour and Capital নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুইটি সহজপাঠ্য ও প্রামাণিক, কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি ও গতি পুরোপুরি বোঝবার পক্ষে গ্রন্থ দুটি যথেষ্ট নয়।

কাজেই এমন পুস্তক চাই যাতে মার্কসীয় অর্থনীতিকে সহজ ক'রে ও নির্ভুল বোঝানো হয়েছে, অথচ যাতে কোনো প্রশ্নকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, অসংখ্য অপব্যাখ্যার ভেতর থেকে সত্যকার ব্যাখ্যা বেছে নেওয়া। লিয়নটিয়েভের বইটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে বইটি মার্কসীয় অর্থনীতির নির্ভুল ব্যাখ্যা হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। বইটির ভিত্তি মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌সের লেখা ক্লাসিক। লেনিনের মার্কসীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যাও বহুস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। পুঁজিতন্ত্রের শেষ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রথম সমরোত্তর যুগের পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট বইটিতে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী বৈপ্লবিক এবং যাঁরা কর্মজগতের নিয়ামক হিসাবে অর্থনীতি শিখতে চান তাঁদের পক্ষে গ্রন্থটি বিশেষ উপযোগী। এতদিনে লিয়েনটিয়েভের বইটির বাংলা অনুবাদ বার হোলো এটা খুব সুখের বিষয়। অনুবাদ নির্ভুল ও খুব ঝরঝরে হয়েছে। অনুবাদটি পড়তে পড়তে মানে বোঝবার জন্য এক-আধ জায়গা ছাড়া কোথাও ইংরাজি সংস্করণটা উল্টাতে হয়নি। দামও সস্তা হয়েছে বলতে হবে। আশা করি বইটি পড়ে আমাদের প্রভুদের দেওয়া অর্থনীতির শিক্ষা আমরা কিছুটা ভুলতে পারবো।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

MUSLIM POLITICS IN INDIA, : By Binayendra Mohon Chaudhuri, Orient Book Company, Rs 3/-.

কলকাতার একটা নামজাদা কাগজে এই কেতাবের তারিফ পড়ে, আর সভা-সমিতিতে বিনয়েন্দ্রবাবুর ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আশা হয়েছিল যে ভারতে মুসলিম রাজনীতির মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তিনি খানিকটা আলোকপাত করতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে তিনি আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন।

বইয়ের প্রথম পাতাতেই লেখক বলতে চেয়েছেন যে এদেশের মুসলমানরা তাজ্জব ধরনের মানুষ। যেমন কম্যুনিস্টদের সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রাহ্য না করলেও তারা সোভিয়েট-ভক্তিতে গদগদ, তেমনই অন্য দেশের মুসলমানরা তাদের ভারতীয় সমধর্মীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

উদাসীন হলেও ভারতীয় মুসলমানরা কেবল বাইরের মুসলিম মুলুকগুলির দিকে চেয়ে থাকে, ইসলামের মায়া তাদের কাছে দেশপ্রেমের চেয়ে অন্তরঙ্গ। অর্থাৎ কি না, এদেশের মুসলমানদের স্বভাবই এমন যে তাদের নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতার লড়াইয়ে জুড়ে দেওয়া যায় না।

সুতরাং ওয়াহাবি আন্দোলনের যে আলোচনা বিনয়েন্দ্রবাবু করেছেন, সেটা যে অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রায় নিরর্থক, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সার সৈয়দ আহ্‌মদ্ যে কোন এক বেক্-সাহেবের হাতের পুতুল ছিলেন, সে-উপকথাও পাঠক এখানে পাবেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে সারা ভারতের মুসলিম মহলে যে আলোড়ন এসেছিল, তার তাৎপর্য বোঝার সামান্য মাত্র চেষ্টা লেখক করেননি। খেলাফৎ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রূপ লেখার কোথাও ফুটে ওঠেনি।

ঠিক সওয়া দু' পাতায় তিনি ১৯২৪-২৬ সালের সাম্প্রদায়িক ঝগড়া আর তা মেটাবার জন্য ঐক্য সম্মেলনের বিষয় আলোচনা করেছেন। কেন যে অমন দাঙ্গার পর দাঙ্গা বেধে চল্‌ল, আর দু'পক্ষেরই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতারা ঐক্য সম্মেলনে জড়ো হয়েও একটা সুরাহা করতে পারলেন না, সে-কথা বিনয়েন্দ্রবাবুর মনের 'ম্যাপে' ছিল বলেই মনে হয় না।

জিন্নাসাহেব এমন জাঁদরেল নেতা হয়ে বসলেন কেমন করে, এ-সওয়ালের জবাবে তিনি আর এক ধুরন্ধরের লেখা তুলে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে মুসলিম নেতাদের মধ্যে হঠাৎ এমন সড়ক লেগেছিল যে জিন্না ছাড়া আর বাতি দেওয়ার কেউ রইল না! মাত্র এক জায়গায় বিনয়েন্দ্রবাবু একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন; কংগ্রেস যে লীগ এবং জিন্নার সঙ্গে ব্যবহারে অহঙ্কারী ভাব দেখিয়েছিল, এ-কথা তিনি স্বীকার করেছেন (পৃঃ ৪৬), কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান তিনি করেননি। বিনয়েন্দ্রবাবু বুদ্ধিমান মানুষ; কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে শেষকালে যে সাপ বেরিয়ে পড়বে, তা তিনি পছন্দ করেন না।

বিনয়েন্দ্রবাবুর রাজনীতি যে কি, তা বুঝতে গেলে একটু কাঠখড় পোড়াতে হয়। এক একবার মনে হয় যে তিনি বুঝি কংগ্রেসের ভক্ত। কিন্তু যখন তাঁকে বলতে দেখি যে মিস্টার জিন্না ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 'ফেডারেল' অংশ চালু হতে পারে দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছিলেন (পৃঃ ৫৪), তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে ঐ 'ফেডারেল' অংশের বিরুদ্ধেই তো কংগ্রেস সহস্রমুখে প্রতিবাদ জানিয়েছিল! অবশ্য বইটির ভূমিকা দেখলে আর পাঠকের মনে বিনয়েন্দ্রবাবুর রাজনীতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তিনি গম্ভীরভাবে পাঠককে জানিয়েছেন যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অখণ্ড ভারত সম্পর্কে যে গভীর আবেগ পোষণ করেন তার অনুধ্যান করে যে-কোন লোকের পক্ষে অনুপ্রেরণা অনুভব না করাই অসম্ভব। শ্যামাপ্রসাদবাবুর কল্যাণেই যে "কংগ্রেস লীগের দাবী বরবাদ করা ব্যাপারে আগের চেয়ে কড়া মনোভাব দেখাচ্ছে" এতে বিনয়েন্দ্রবাবু খুবই সন্তুষ্ট।

এ-বইয়ের গোড়ায় তাই রয়ে গেছে গলদ। পাকিস্তান কাকে বলে, তার একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে লেখক নিরপেক্ষ অধ্যাপকের মত পাকিস্তানেরও বিপক্ষে যুক্তি কয়েকটা দিয়েছেন, এবং মনের আনন্দে সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাকিস্তান জিনিসটা অচল। এখানে সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থক বলে প্রমাণ করার একটা চেষ্টা তিনি করেছেন; মতলব নিয়ে ওকালতী করতে গেলে যে অনেক কথা

চেপে যেতে হয় আর অপর পক্ষের বিরুদ্ধে জেনে শুনে অনেক মিথ্য অভিযোগ আনতে হয়, বিনয়েন্দ্রবাবু তা বোঝেন এবং বুঝে-সুঝেই এরকম একটা সততাবিবর্জিত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কম্যুনিস্টদের কথা পুরোপুরি বাদ দিয়েও তিনি পাকিস্তান ব্যাপারটা যে অসার তা অন্য উপায়ে প্রমাণ করতে পারতেন। শুধু মুসলমানদের স্বভাব হল বিচিত্র, তাদের নেতারা হল অদ্ভুত, তাদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হল অকাট্য—এমনি কতগুলো আর্যবাক্য ব্যবহার করলে তিনি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান দাবীকেই মুসলমান সমাজে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবেন। একথা যে বিনয়েন্দ্রবাবু বোঝেন না বিশ্বাস করাও শক্ত, কিন্তু মানুষের মনে যে কি থাকতে পারে তা স্বয়ং শয়তানও জানে না বলে প্রবাদ তো চলে আসছে!

'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডে' কি ছিল, তা এ-বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা আছে। মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটা খবর দু'এক জায়গায় ছড়ানোও আছে। কিন্তু এ-বই পড়ে কিছুতেই খুশি হতে পারলাম না। ১৯৪৬ সালের জুনমাসে এ-বই প্রকাশ হয়েছে। ৫৩ পৃষ্ঠাতে লেখক বলছেন: "(লীগ শাসনে) বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে নির্লজ্জভাবে উৎসাহ দেওয়ার জঘন্য চিত্র দেখা যায়। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের যে শতকরা খুব একটা উঁচু হারে চাকুরী দেওয়া হয়, এটা সংখ্যায় হিন্দুদের নানা অভিযোগের মধ্যে প্রায় নগণ্য বললেই চলে। **এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির আশা** এবং শাসনবিভাগে সততা ও কর্মক্ষমতা **বহুকালের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে।**" এ-রকম বক্তৃতাগন্ধী লেখা পড়লে জানতে ইচ্ছা করে যে এটা কি "হিন্দু জাতীয়তা"র চণ্ডে দাঙ্গার ভয় দেখানো?

বিনয়েন্দ্রবাবুর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ—মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে লেখনী ধারণ যদি করতেই হয়, তো এত অবজ্ঞা, এত তাচ্ছিল্য, এত পূর্বনির্ধারিত সংস্কার বর্জন না করলেই নয়। মুসলমানের বক্রতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে কয়েকজন শিক্ষিত হিন্দুর বাহবা লোভে মুগ্ধ হওয়ার অধিকার কোন চিন্তাশীল দেশভক্তেরই নেই। আর রাজনীতির যে-রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানের ভেদাভেদ নেই, যেখানে মানুষ সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে আর মানুষেরই বহুযুগ সঞ্চিত লোভ-জটিল বন্ধনের বিরুদ্ধে, যেখানে মানুষ চাষ করে, হাল ধরে, কল চালায়, সে-রাজ্যের সন্ধান না পেলে আজ যে-কোন রাজনীতি সম্পর্কেই রচনাবিলাস থেকে বিরত হওয়া উচিত।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সংবাদ

সাম্প্রতিক চিত্র-প্রদর্শনী

গত কয়েক বছর ধরে শিল্পী কুর্ট লারিশের বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী এদেশের শিল্পামোদী জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সাধারণত আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীদের রচনায় যে সব বিভিন্ন স্কুল-সংশ্লিষ্ট মতবাদ ও শিল্পদর্শনের ঘোষণা দেখতে এদেশে আমরা অভ্যস্ত, ল্যারিশের ছবিগুলি তার থেকে স্বতন্ত্র ধরনের এবং অনাড়ম্বর একটা শিল্প-আস্বাদ আছে বলেই বোধহয় আমরা এই অস্ট্রিয়ান্ শিল্পীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে পেরেছি। এই শিল্পকর্মগুলিতে শিল্পীমনের আন্তরিকতাটুকু সহজ পথেই আত্মপ্রকাশ করেছে—কারণটা হয়ত এই যে, ইউরোপের কোন আর্ট অ্যাকাডেমিতে লারিশ্ শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন নি; সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় আত্মচর্চার মধ্যে দিয়ে তিনি শিল্পী হয়ে উঠেছেন। ফলে, বিশেষ কোন স্কুলের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত। প্রতিবারের মত এবারকার প্রদর্শনীতেও তাঁর সেই সরল ও সহজ একটি শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল।

খুব মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, লারিশের চিত্রপদ্ধতি অবশ্যই ইম্প্রেসনিজ্‌ম্-এর প্রভাবাশ্রয়ী—শিল্পমতবাদে যাঁরা চরমপন্থী তাঁদের বাদ দিয়ে এযুগের প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় শিল্পী সম্বন্ধেই একথা কমবেশী প্রযোজ্য, কারণ আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলায় ইম্প্রেসনিজ্‌মের যুগই সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ ইম্প্রেসনিস্ট্ ছবির বিধি-নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকানুনগুলির ব্যতিক্রমও লারিশের মধ্যে লক্ষণীয়ঃ যেমন, তিনি বর্ণ-বিশ্লেষণী নন এবং রঙের প্রতিপূরণ সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন। অথচ রং-ব্যবহারে বিপরীত 'টোন'-এর সার্থক প্রয়োগে তাঁর ছবিগুলি—বিশেষত ল্যাণ্ডস্কেপগুলি—অধিকতর প্ল্যাস্টিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। লারিশের রচনায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য এইখানে। শিল্প-আবেদনের দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর পোর্ট্রেট্‌গুলির চরিত্র-চিত্রণ। "তিব্বতী হাসি"র ব্যক্তিচরিত্রে উল্লাসভরা সরলতাটুকু আশ্চর্য রকম ফুটেছে।

সাধারণভাবে কিন্তু লারিশের শিল্পকর্ম রোমান্টিক মেজাজের হওয়া সত্ত্বেও, তার আবেদন একটু যেন বেশী রকম সংযত। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রসন্ন, কিন্তু বোধহয় মানসিক আবেগের খানিকটা অভাব আছে—যার ফলে ছবির বিষয়বস্তুর রূপায়ণে তাঁকে প্রায় নিরাসক্ত বলে মনে হয়। শিল্পসৃষ্টির কাজে তিনি আন্তরিক, কিন্তু শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ নন; দার্জিলিঙের বাজার, নেপাল সীমান্তের গ্রাম-মাঠ-পাহাড় কিম্বা ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের জনারণ্য তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এঁকেছেন, কিন্তু এইসবের সঙ্গে শিল্পীমনের যেন আত্মসমীকরণ ঘটেনি—প্রায় সাত বছর এদেশে থাকার পরেও। বারবার মনে হল, তিনি যেন এতদিনের পরিচয়ের পরেও এদেশকে দেখছেন অতিথির চোখে। হয়ত লারিশ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন—তাই

এই দূরত্বের মনোভাবকে অতিক্রম করবার জন্যেই বোধহয় অধিকাংশ ছবিতে তাঁকে উচ্চকিত চড়া রং ব্যবহার করতে হয়েছে; তাতে শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয়নি, কিন্তু তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে আজও বিদেশীর দূরত্ব রয়ে গেছে।

ইন্‌ডিস্ট্যুট অফ আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি গত পাঁচ-ছ বছরে সংগঠনের দিক থেকে রীতিমত শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। শ্রমশিল্পের সঙ্গে চারুশিল্পের যোগাযোগ ঘটানোর কাজে এঁদের আন্দোলন দেশের লোকের সোৎসাহ সমর্থন লাভের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ব্যাপকতা পেয়েছে। তথাকথিত কমার্শিয়াল আর্ট বা কারুচিত্রশিল্প সম্বন্ধে সাধারণত যে একটি উন্নাসিক মনোভাব দেখা যায় সেটা যেন ইদানীং অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে—প্রধানত এই আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি বার্ষিক প্রদর্শনীর এটা একটা প্রত্যক্ষ সুফল। বহু প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী যেমন ক্রমশই শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, তেমনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপকরণে রূপসৃষ্টির সার্থকতা জাতীয় সংস্কৃতির দিক থেকেই দেশের লোকের কাছে আজ স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিশেষত ভারতবর্ষের মত শ্রমশিল্পে পশ্চাদ্‌বর্তী দেশে যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যে খানিকটা সৌন্দর্যের অভাব ঘটা স্বাভাবিক, কারণ উৎপাদকের দৃষ্টি থাকে একান্তভাবে standardization-এর দিকে সীমাবদ্ধ। শিল্পীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেলে যন্ত্রনির্মিত জিনিসে এই রূপের অভাব মিটতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান সেদিকে শিল্পীদের সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করে সাড়া পেয়েছেন—এটা একটা মস্তবড় শুভলক্ষণ। এর ফলে চারুশিল্পীরা যে শ্রমশিল্পীদের জীবনের আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন, এমন আশা করাটা নিশ্চয়ই খুব একটা দুরাশা নয়।

প্রদর্শনী হিসাবে অবশ্য এবারকার দ্রষ্টব্যগুলিতে গত বছর বা তার আগের বছরের উচ্চাঙ্গের শিল্পআদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকেনি—কয়েকটি নতুন ও বিচিত্র বিভাগীয়-শিল্পসমাবেশ সত্ত্বেও। হয়ত দেশের বর্তমান অশান্তিকর অবস্থা এর জন্যে অনেকখানি দায়ী, অন্যান্যবার পোস্টার ও বিজ্ঞাপন বিভাগটাই দর্শককে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। এবারে কিন্তু এই দুটি বিভাগ রীতিমত দুর্বল বলে মনে হল। সরল ও বলিষ্ঠ রং-রেখায় পোস্টারের আবেদন সংক্রমণশীল করে তোলার চেয়ে মধুর ও ললিত আবেশ সৃষ্টি করার দিকেই যেন শিল্পীরা বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। গ্রন্থ-অলংকরণ বিভাগে ওমর খৈয়ামের ছবিগুলির মনোনয়নে কর্তৃপক্ষ আরও একটু সূক্ষ্মরুচির পরিচয় দিতে পারতেন বলেই আশা করি। বাতায়ন-সজ্জা এবং গৃহসজ্জার বিভাগগুলিও কষ্টকল্পিত এবং আড়ষ্ট।

সবচেয়ে নিরাশ করেছে ভিত্তিচিত্রের (ম্যুরাল) অধিকাংশ কার্টুনগুলি। মনোহর যোশী, চিত্তপ্রসাদ এবং মহাজন-অঙ্কিত তিনটি ভিত্তিচিত্র ছাড়া বাকী সবকটাই বিষয়বস্তু এবং রচনার দিক থেকে দ্রষ্টব্য হিসাবে গণ্য হবার অনুপযুক্ত। এই তিনজন শিল্পীই বোম্বাইয়ের, সেটাও উল্লেখযোগ্য। চিত্তপ্রসাদ অবশ্য বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী এবং তাঁর মিশ্র রংগুলির স্বতন্ত্র ও সংযত ব্যবহার ও বিষয়বস্তুর সুন্দর অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন্‌টিকে যে কেন শুধুমাত্র একটা "Certificate of Merit" দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রীমতি করুণা সাহা প্রথমবার প্রতিযোগিতায় নেমেই যে তিনটি বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবারকার প্রদর্শনীতে "Outstanding Productions" নামে নতুন একটা বিভাগের অবতারণা করা হয়েছে। এই বিভাগে একমাত্র উড়িষ্যার বয়নশিল্পগুলি ছাড়া আর কোনটাই এমন কিছু outstanding নয়। কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী রঙিন ছিটের ডিজাইনের কাজগুলি গতবারের চেয়ে এবারে উন্নততর বলে মনে না হলেও, এর উৎকর্ষের সম্ভাবনার দিকে শিল্পীরা অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন বোধহয়।

সরকারী আর্ট স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনীর আলোচনা প্রসঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে যে কথা বলে আসতে হচ্ছে, এবারেও তার থেকে বিশেষ নতুন কিছু বলার নাই। এই প্রদর্শনীতে সাধারণত যে একটা গতানুগতিকতার ছাপ দেখা যায় এবারেও তার খুব বেশী ব্যতিক্রম ঘটেনি। শ্রীযুক্ত যামিনী রায় এবারের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন, এটা উল্লেখযোগ্য। ছাত্রেরা মোটের ওপর বিশেষ কয়েকটি শিল্পআঙ্গিকের নিতান্ত অ্যাকাডেমিক চর্চা করে যাচ্ছেন এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিশেষ উৎসাহ দিতে চান না বলেই মনে হয়। বিষয়বস্তুর সাধারণত্ব থেকেই যাচ্ছে। ছবি মনোনয়নের ব্যাপারে কমিটির অসীম উদারতা অক্ষুণ্ণ থাকার ফলে অজস্র মাঝারি এবং বাজে ছবির ভীড়ে স্বল্পসংখ্যক ভালো চিত্রকর্মগুলি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, মোটের ওপর এবারকার জলরঙের কাজগুলি গতবারকার চেয়ে উন্নততর হয়েছে। গ্র্যাফিক শিল্পের বিভাগটি তেমনি এবারে বেশ খানিকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁদের কোন-না-কোন শিল্পকর্ম সাধারণভাবে দর্শককে আকৃষ্ট করে তাঁদের মধ্যে গোবর্ধন আশ, মুস্তাফা আজিজ, অরূপ দাস, নমিতা সাহা, বৈদ্যনাথ শেঠ, ইথেল শী, মনোরঞ্জন ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রণেন আয়ান দত্ত গতবারে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবারেও তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় পৃথ্বীশ রায়চৌধুরীর আঁকা কয়েকটি ছবির কথা। এই ছবিগুলিতে শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা ও নিজস্ব শিল্পআদর্শ বিশেষ স্পষ্ট কোন নির্দেশ এখনও পায়নি, তবু আর্ট স্কুলের সেই অতি স্বল্পসংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী একজন—যাঁর রচনায় নতুনতর শিল্প অভিযানের সার্থক প্রয়াস দেখা গেল।

ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীটি এবারকার একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। নামের দিক থেকে একটা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য সূচিত হলেও, শিল্পীমন যে তার প্রভাব থেকে মুক্ত সেটা এই প্রদর্শনীতে গিয়েই উপলব্ধি করা যায়, কারণ বিষয়বস্তু বা রচনার দিক থেকে এর প্রত্যেকটি ছবির আবেদনই সর্বজনীন। ছবির সংখ্যাধিক্যে এই প্রদর্শনীটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, ফলে প্রায় প্রত্যেক ছবিটিই আলাদাভাবে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ পেয়েছে। উদ্যোক্তারা যে ছবি নির্বাচন ও সংস্থাপনের ব্যাপারে চমৎকার একটি সংযম ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্যে তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

এই প্রদর্শনীর সফলতার প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন জয়নুল আবেদীন ও সফিউদ্দীন আহ্‌মেদ। দুজনেই বাংলার প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী এবং এই ছবির মেলায় এঁদের শিল্পকর্মগুলি যেমন উজ্জ্বল তেমনি বিচিত্র। আবেদীনের যেসব ছবি এখানে দেখানো

হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই অবশ্য পূর্বপ্রদর্শিত। মুসলিম শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনীতে গিয়ে জয়নুল আবেদীনের মত মহৎ শিল্পীর কাছে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করবার থাকে। অথচ অন্যান্য প্রদর্শনীর মত এখানেও তাঁর কতকগুলি সুপরিচিত ছবিই পুনঃপ্রদর্শিত হতে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন ইদানীং শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন কোন দিক্ নির্দেশ করতে পারছেন না। যে সমাজ-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠতা নিয়ে তাঁর অভ্যুদয়, বৈচিত্র্য দিয়ে তাকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করে তুলছেন না কেন? শিল্পসৃষ্টির নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উপকরণ আবিষ্কারে তিনি নিজের প্রতিভাকে নিযুক্ত করছেন না কেন?

কিন্তু সফিউদ্দীন আহ্‌মেদের শিল্পকর্মগুলি আশ্চর্য সুন্দর। কোন একটি প্রদর্শনীতে একই শিল্পীর এতগুলি শ্রেষ্ঠ রচনার সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। এতদিন তিনি এচিং ও লিথোর কাজের মধ্যে দিয়েই আমাদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু এবারে জল-রঙে আঁকা বিভিন্ন দৃশ্যচিত্রে কম্পোজিশনের সৌকর্যে ও রং ব্যবহারে যে মৌলিকতা তিনি দেখিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। আমাদের দেশে যে সব শিল্পী ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন, তাঁদের ছবিতে হয় প্রাচ্য অলঙ্করণ-পদ্ধতি, আর না হয় পাশ্চাত্য বর্ণপরিপ্রেক্ষিত মুখ্য হয়ে ওঠার ফলে শিল্পীর আসল রূপদৃষ্টি যেন খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; কিন্তু সফিউদ্দীনের শিল্পদৃষ্টি উজ্জ্বল ও কল্পনার ঐশ্বর্যে প্রাণময়। মাঠ-বাটের আদিগন্ত ব্যাপ্তি, ময়ূরাক্ষীর শান্ত সৌন্দর্য, শালগাছের গম্ভীর প্রশান্তি—প্রকৃতির রূপের এই মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ আনন্দ তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা। শিল্পীমনের এই আনন্দের স্পর্শে চড়া রঙের কিছুটা দুঃসাহসিক ব্যবহারও কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে আশ্চর্য একটি সংযত মধুরতা পায় 'লাল সড়ক' ছবিটি তার সুন্দর উদাহরণ।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আনওয়ারুল হক, আমিনা আহ্‌মেদ ও কামরুল হাসানের রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

এই প্রদর্শনীর অভাবের দিকটাও উল্লেখ করতে হয়। মুসলমান চিত্রকরদের আঁকা এই ছবির মেলায় পারসিক বা মুঘল ঐতিহ্য-অনুসারী চিত্রপদ্ধতির কোন প্রয়াস দেখা গেল না। মুসলিম 'ক্যালিগ্রাফি'র সূক্ষ্ম সুষমা ও রেখারচনার চারুতা আজও বিশ্ববন্দনার বিষয় হয়ে আছে। আধুনিক করণ-কৌশলের সাহায্যে মুঘল-শিল্পের প্রাচীন পদ্ধতিগুলির ব্যবহার সাম্প্রতিক শিল্প-চাহিদা মেটানোর কাজে যদি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে আমরা নতুন নতুন শিল্পসম্পদের অধিকারী হব। মুসলিম শিল্পীরা নিশ্চয়ই আবদুর রহমান চাগ্‌তাই-এর দুর্লভ শিল্প-প্রতিভার উত্তরাধিকার ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হননি।

রবীন্দ্র মজুমদার

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

"কয়েকজন শিল্পী ধার-করা বিদ্যা নিয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলেন। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও যেমন কুলীন হতে পারল না, শ্লোগানের জয়গান গেয়েও লেখকরা তেমনি প্রগতিশীল হতে পারেনা। তাঁদের লেখার ভেতর নূতনত্ব অনেক কিছুই পাওয়া গেল কিন্তু প্রাণ পাওয়া গেলনা।" এই মত ব্যক্ত করেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত পাটনা থেকে ছাপা 'প্রভাতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নূতন সাহিত্য' প্রবন্ধে।

কেন ঐজাতীয় লেখকেরা সত্যিকারের প্রগতিশীল হয়ে উঠিতে পারেন নি তার কারণ, সুবোধবাবুর মতে "প্রগতির জন্য ফরমাইশী লেখা হতে পারেনা, প্রগতির নোটবুক মুখস্থ করে একটা জাতি প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে আর একটা কারণে। লেখকরা নিজে কেউ প্রগতিশীল নন কারণ প্রগতিকে তাঁরা দেখবার চেষ্টা করেন দূর থেকে...কিন্তু নিজেরা প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেন নি। কারণ লেখকরা কেউ বিপ্লবী নন।"

অতঃপর প্রগতি ও বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করে সুবোধবাবু বলেছেন যে সহজ বিজ্ঞান আমাদের শুধু এই আশ্বাস দিতে পারে যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয় কিন্তু সম্ভব ও বিপ্লবের প্রয়োজন এই সম্ভবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। এই বিষয়ে আমাদের দেশের লেখকরা যথেষ্ট সচেতন নন বলেই প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরা ফ্যাশিস্তবাদকে সমর্থন করে গেছেন।

আমাদের দেশের অনেক লেখক, হয়তো বেশির ভাগ লেখক সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণ খাটে, কিন্তু যারা অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয়ভাবে প্রগতি সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করছেন তাঁরাও যে সুবোধবাবুর মতে, প্রগতির পরিপন্থী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের এই উদ্ধৃতিতে।

> আমাদের দেশের আবহাওয়া ফ্যাশিস্তবাদের অনুকূলেই বইছে। বর্তমানে কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কারণেই আমাদের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়েছে। কারণ কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘেরই পাল্টা জবাব। কিন্তু এ ধরনের পাল্টা জবাবে আমরা বিচলিত হইনি। আমাদের বিচলিত করেছে 'প্রগতি'র ছাপমারা সাহিত্যিকরা। কারণ তাঁরা প্রগতির নামে যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন তার সঙ্গে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের মূলগত প্রভেদ কোথাও নেই। সুতরাং প্রগতির ছদ্মবেশে তাঁরাও ফ্যাশিস্তবাদকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়াল ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আর গাঁ-ই যদি উজাড় হয়, তাহলে সাহিত্য রচনাই বা কে করবে আর কেই বা তা পড়বে? আসল কথা সুবোধবাবু তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অবাস্তবতার প্রতিবাদে নিজেও অবাস্তবতার মোহে

ভারসাম্য হারিয়েছেন। 'যাঁরা প্রগতিশীল নন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল হতেই হবে—একথা সত্য হতে পারে কিন্তু একেবারে সরাসরিভাবে নয়। সরল রেখা টেনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে কি আলাদা করা সম্ভব?

অথচ সুবোধবাবু স্বীকার করেন "নূতন সাহিত্য রচনার আন্দোলনের আজ প্রয়োজন আছে। পাঠক সমাজের রুচি বদলে গেলে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং সেই সঙ্গে নূতন সাহিত্যিকও তৈরী হবেন। শুধু তাই নয়, আজ যাঁরা অচেতন আছেন তাঁরাও সচেতন হবার সুযোগ ও সুবিধা পাবেন।" যদি তাই হয় তাহলে 'প্রগতি'র ছাপমারা সাহিত্যিকরা, অর্থাৎ, ধ'রে নিতে হবে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গেই যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁরা এমন কি অপরাধ করেছেন? তাঁদের সকলের —এমন কি বেশির ভাগের—রচনাতেই কি প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের সঙ্গে 'মূলগত' ঐক্য দেখা যায়? যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিচলিত হবার কারণ আছে। কিন্তু যদি ঐ সংঘভুক্ত দুচারজন লেখক এখনো সত্যি মনেপ্রাণে প্রগতিশীল না হয়ে থাকেন—তার প্রতিকার কি? আমি বলব, তার প্রতিকার 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র গ্রহণ। এবং যেহেতু সুবোধবাবুও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছেন অতএব ধরে নিতে পারি তিনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন।

একবার সুবোধবাবু পরামর্শ দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচনা দিয়ে আন্দোলন শুরু করতে। (তাহলে কি আন্দোলন শুরু হয়নি?) যাই হোক, "সাহিত্যে রুচি পরিবর্তন করবার জন্য সাহিত্য-সমালোচনা দরকার" একথা খুবই সমীচীন। "আমরা যদি নামকরা লেখকদের নামকরা বই নিয়ে এই সমালোচনা আরম্ভ করতে পারি তাহলে আমরা অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই এত বিরোধের সৃষ্টি করতে পারবো যে আমাদের এই প্রচেষ্টা ক্ষীণ হলেও আন্দোলনের মর্যাদা পাবে।"

কী ভাবে সাহিত্য সমালোচনা করা দরকার সুবোধবাবু তার দুটী নীতির নির্দেশ করেছেন। "সমালোচনার প্রথম নীতি হবে এই যে আমরা বস্তবাদকে চরম সত্য ব'লে মেনে নেব। এটা মেনে নেওয়া দরকার এই জন্য যে তাহলে মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করা যায়।.....যে সাহিত্যে ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে আমরা সে সব সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা করব।"

সুবোধবাবু পরিষ্কার ক'রে বলেননি যে এই নির্মম মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে শুধু এ যুগের না বিগত যুগের সাহিত্যিকদেরও। ভগবানকে মেনে নেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাতিল করব, না করব না?

সুবোধবাবুর দ্বিতীয় নীতির অর্থও খুব পরিষ্কার নয়। "আমরা কোনো প্রভুত্ব মানব না। আইনের প্রভুত্ব বা নীতির প্রভুত্ব বা ধর্মের প্রভুত্ব। কারণ প্রভুত্ব মেনে নিলেই আইন নীতি বা ধর্ম এগুলো যে ভালো তাও মেনে নিতে হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করলেই তাকে অন্যায় বলতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে। তা থেকে দাঁড়াবে যে সমাজটা মোটামুটি ভালই শুধু কতকগুলি খারাপ লোক তাকে খারাপ করে তুলেছে।" সুবোধবাবু বলতে চেয়েছেন যে প্রগতিশীল সাহিত্য হবে প্রতিবাদের সাহিত্য ও এই প্রতিবাদ কতকগুলি খারাপ লোকের নয়—গোটা সমাজ-

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো নীতিকেই না মানা কি এই প্রতিবাদের সেরা উপায়? নির্জলা ব্যক্তিবাদও তো কোনো নীতিকেই মানতে চায় না।

সুবোধবাবুর মতামত বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করেছি এইজন্য যে তাঁর প্রবন্ধটি সত্যিই আলোচনার যোগ্য ব'লে মনে করি ও যদিও অনেক জায়গায় তাঁর মতামত সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছি, তবু, মোটের ওপর, তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়। সুবোধ-বাবুর মূল বক্তব্য এই যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয়, দর্শকের মতন উপভোগ করবার জিনিস নয় কিন্তু তা সম্ভব, ও এই সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার ব্রত সকল মানুষকে গ্রহণ করতে হবে, সাহিত্যিককেও। এ কথা সার কথা। কিন্তু সুবোধ-বাবু প্রসঙ্গত আরো যে-সব কথা বলেছেন সেগুলির আলোচনা হওয়া দরকার, বিশেষভাবে সমালোচনার যে দুটি মূলনীতি তিনি নির্দেশ করেছেন তা গ্রহণীয় কিনা এই বিষয়ে এই পত্রিকার পাতায় আমরা তীব্র বিতর্ক আহ্বান করছি।

* * * *

"আমরা প্রচারক নই এই আত্মাভিমান সাহিত্যিকদের থাটেনা" সুবোধবাবুর এই কথার সমর্থন পেলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত বার্ষিকী 'ক্রান্তি'র প্রথম পাতাতেই। লীলাময় রায় 'সৈনিক' কবিতায় লিখেছেন :

ইজমে কী আসে যায়। আমি চাই একাগ্র সৈনিক।
লক্ষ্য যদি এক হয় উপলক্ষ্য হোক না শতেক।
একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী যতেক।
দেশ যদি অন্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক।
হে অশান্ত, করো মনঃস্থির। আগে আপনার মনে
জয়ী হও নীতি আর মন্ততার নিত্যতন রণে।

এই জন্যেই কি নীতির বিরুদ্ধে সুবোধবাবুর এত আপত্তি? লীলাময় রায়ের এই কবিতা সত্ত্বেও 'ক্রান্তি' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই প্রগতিবাদী। এর সম্পাদকদ্বয়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অমৃতকুমার দত্ত নামকরা লেখক এবং প্রগতিশীল লেখক। এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নামকরা 'প্রগতির ছাপমারা' লেখক আরো অনেক আছেন : বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। লীলাময়ের গোষ্ঠীর লেখক—অর্থাৎ যাঁরা গোষ্ঠী মানতে চান না—আছেন অমিয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলের লেখার সমাবেশে যে পত্রিকা গ্রথিত হয়েছে তাতে বৈচিত্র্য থাকবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই—কিন্তু তারিফ করবার জিনিস এই পত্রিকাটির সাহিত্যিক অখণ্ডতা। এই বিষয়ে 'ক্রান্তির' সাফল্য বিরল। পুজোর বাজারে যে-সব বিপুল বহরের রংচঙে কাগজ ছেলেভুলোনো খেলনার মতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে 'ক্রান্তি'র তফাৎ একেবারে মূলগত! প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলন যে সার্থক-ভাবে করা যেতে পারে ও এই আন্দোলনে যাঁরা প্রচার সাহিত্যকে এড়িয়ে চলতে চান তাঁদেরও যে স্থান হতে পারে—'ক্রান্তি' তার প্রমাণ।

হিরণকুমার সান্যাল

পাঠক-গোষ্ঠী

'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য'

"পরিচয়"-সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়-এ 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধের লেখক তাঁর প্রবন্ধের নামে যে বিরাট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে টেকনিকের সংকট সম্পর্কে কতকগুলি অসতর্ক মন্তব্যে পর্যবসিত হয়েছে। উপন্যাসে টেকনিকের সংকট সম্পর্কে তিনি যে বিশ্লেষণ ও সমাধান দিয়েছেন তা মোটামুটি দেওয়া হল।

"ইয়োরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে...যেমন...তেমনি...আমাদের বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও... কেউ একটা আধুনিক কালোপযোগী নিটোল আঙ্গিক গড়ে তুলতে পারেননি।" এই সংকট দেখা দিয়েছে। কেন সংকট? "...বিজ্ঞানের বাস্তব প্রগতি (technical advance) সম্বন্ধে আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই বলে'।" কেন ঘটল এই জ্ঞানের অভাব? "...এ হল প্রকাণ্ড ফাঁকি, ভয়াবহ অশিক্ষা-কুশিক্ষার ফল।" সমাধান আছে—new tools! "...এই new tools-এর দৈন্যের প্রধান কারণ বাস্তব জগতে 'new tools of production' সম্বন্ধে শোচনীয় জ্ঞানের অভাব"—সেই অভাব ঘুচলেই আসবে সেই new tools!

উপন্যাসে new tools সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা new tools of production-এর সঙ্গে এমন একটা যান্ত্রিক ঐক্যে বন্দী হয়ে গেছে যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, বিজ্ঞানের জীবনদর্শনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের new tools-এর প্রশ্নটি যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা তিনি দেখতে পাননি। কারণ হল তাঁর যান্ত্রিক চিন্তার ফল। সবেমাত্র আত্মসচেতন হয়ে উঠছেন আমাদের নতুন সাহিত্যিক, আমাদের নতুন সাহিত্য, আমাদের নতুন সমালোচক। এ তারই এক অবশ্যম্ভাবী পর্যায়।

প্রবন্ধ লেখক তাই সমাজের ওপর, মানুষের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব বা সে প্রভাবের অভাবটাকে দেখেছেন সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্কের যে একটা ইতিহাস আছে তা না দেখেই তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং সংকটের সমাধানকল্পে নেহাত যান্ত্রিক ফতোয়া প্রচার করেছেন।

কার্যক্ষেত্রে যে ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করে কোন সংস্কৃতি তার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। তা থাকলে যে সংস্কৃতি বাক্‌সর্বস্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সাহিত্যক্ষেত্রকে

আজ একরকম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নই বলা যেতে পারে! কিন্তু এ চলতে পারে না। আবার, বিজ্ঞান ও সাধারণ সংস্কৃতির ঐক্য আপনা থেকেই ঘটবে না। তার জন্যে বিজ্ঞান শিক্ষার (বিজ্ঞানেরই) কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চাই। এ-কথা বলেছেন বৈজ্ঞানিক জে. ডি. বর্নাল।

বিশেষ করে আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার (বিজ্ঞানের) অবস্থা, প্রসার ও প্রচারের পথে যে বিরাট বাধা তার ফলে দেশের সাধারণ সংস্কৃতিজীবনে, শিল্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়া খুবই শক্ত। মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে কোন ব্যাপক ও সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ কী করে ঘটল তার কিছু আলোচনা করলেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আদিম সমাজের শিল্পীর সৃষ্টিতে শ্রমের রীতিপদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হত; কারণ, তার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। শ্রেণীবিভাগের ফলে শিল্পী শ্রমের রীতি ও পদ্ধতি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। ধনতন্ত্রের যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে সেই বিচ্ছেদ ষোলকলা পূর্ণ হল—কায়িক ও মানসিক শ্রম ও বৃত্তির চরম বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ দেখা দিল। সেই অবস্থার মাঝে ক্রমে নানা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এমন বিশাল যে, সর্বক্ষেত্রে কোন মোটামুটি ধারণা দূরের কথা, সামান্যতম অংশেরও অতি সাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ করাই দুরূহ—এই রকমের একটা কথা বেশ প্রচলিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরাও অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরেকার অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে এই উপলব্ধির অভাবই এই সংকীর্ণতার প্রধান কারণ। তার ফলে ব্যাপক সমাজদৃষ্টির অভাব ঘটে। আর জনসাধারণের বোধগম্য করবার জন্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রচারব্যবস্থার অভাবের ফলেই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব ও জ্ঞানের সংকীর্ণতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণ দুটি আবার সমগ্র সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। প্রধানত এই দুটি কারণেই বিজ্ঞান ও জন-সংস্কৃতি এবং ক্রমে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ ঘটেছে। একদিকে কোন কোন শিল্পী, সাহিত্যিক তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাবের বড়াই করে এক বিশ্রী আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে রয়েছেন; অপর দিকে বহু বিজ্ঞানীও এক অদ্ভুত "দার্শনিক" ভাব নিয়ে বলছেন: সাহিত্য আমি বুঝি না!

সমাজের প্রকৃতি ও গতি বিশ্লেষণ ও নিরূপণের পদ্ধতিও যে অন্যান্য সঠিক (exact) বিজ্ঞানের মতো সমান মর্যাদা দাবী করতে পারে এই স্বীকৃতি এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ না ঘটলে—যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসার না হলে—এবং এমনি করে বিজ্ঞানের গড়া পৃথিবীর রূপ সমগ্র সংস্কৃতির অঙ্গীভূত না হলে বিজ্ঞান ও জন-সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘুচবে না। সে-প্রশ্নটিকে এড়িয়ে প্রস্তর যুগ থেকে 'সংকর ধাতু-যুগ' পর্যন্ত এবং এ্যামিবা থেকে রূপায়ণশক্তিসম্পন্ন মানুষ পর্যন্ত পাইকারী

ফিরিস্তি দিলেই "সাহিত্য ও শিল্পকলার 'মূল' পর্যন্ত" আলোচনা করাও হয় না, "বিজ্ঞানের জীবনদর্শনের দিক"ও দেখানো হয় না।

তাই, কেবল যন্ত্র আর মানুষের স্থূল বাহ্যিক, যান্ত্রিক সম্পর্কটাকেই তিনি দেখিয়াছেন আর তা-ও নেহাত বিচ্ছিন্নভাবে, তাই তিনি ভেবেছেন, ব্ল্যাস্ট ফার্নেস আর ভস্মা ইত্যাদি নতুন-পুরোন tools of production সম্পর্কে একটু জেনেশুনে নিলেই আর "কয়লার রোম্যান্টিক ইতিহাস" জাতীয় কতগুলি হঠাৎ-চমক-লাগানো চালাকি জানা থাকলে সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব এসে যাবে আর 'আধুনিক' কালোপযোগী নিটোল আঙ্গিক' গড়ে উঠবে। আসলে এর ফলে টেকনিক সম্পর্কে বিকৃত ধারণাই সৃষ্টি হয়। কোন শ্রমিকের জীবন অবলম্বনে রচিত গল্পে বা উপন্যাসে সেই শ্রমিকটির বিশেষ শ্রমশিল্পের ইতিহাস আর তার নানা হাতিয়ার ও কাঁচামালের রূপ ও রকম বর্ণনা করে শ্রমিকটিকে যে বইয়ের মাঝে বসিয়ে দিতে পারলেই বুঝি বিজ্ঞান-প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি করা গেল। কিন্তু একেইতো বলা হয় ডক্যুমেণ্টারি ন্যাচুরালিজম'। শুধু যে নিদারুণ ভাগ্য বিড়ম্বনার মাঝে মানুষ পড়েছে, এমনি করে তারই এক রোমান্টিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় মাত্র। আর তার পরিণতি হয় হতাশার মাঝে; তা মানুষকে ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক এই জিনিসটিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ভাগ্যের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানুষের জীবন-নাট্যের গতিটিকে ধরতে হবে সাহিত্যের মাঝে। তবেই সাহিত্যে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' অর্থাৎ বিজ্ঞানের কালোপযোগী ধারা সৃষ্টি হবে। যন্ত্র আজ প্রতিমুহূর্তে মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলবার চেষ্টা করেছে। আবার মানুষও প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে আজকের যন্ত্রপ্রভুকে পদানত করে তাকে মানুষের অনুগত দাসে পরিণত করার জন্যে। সেই মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যন্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও আসবে। তার জন্যে tools of production সম্পর্কে জ্ঞানও চাই; কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেই জ্ঞানই সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব আনবে না। তার আগে, কিংবা হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মানুষকে—সামাজিক মানুষ, ঐতিহ্যের মাঝে গড়ে-ওঠা মানুষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষার মাঝে বেড়ে-ওঠা মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে মানুষ-হওয়া মানুষ—মানবিক মানুষ হিসাবে দেখতে শিখতে হবে। একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অংশ বিশেষের জ্ঞান থাকাটাই সাহিত্যিকের পক্ষে যথেষ্ট নয়—সাহিত্যিকের চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা একবারও না বলে, প্রবন্ধ-লেখক শুধুই 'অ্যাকাডেমিক' অর্থে সাহিত্যিকদের "বৈজ্ঞানিক সুশিক্ষার অভাবের" কথা বলেছেন।

সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও পরিবর্তন আসে, মানুষের মনোবৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটে। শিল্পে-সাহিত্যে সে পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় শিল্পী সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতবাদ বা কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের অভাবের ভেতর দিয়ে এবং তাদের ন্যায়-নীতি-বোধের ভেতর দিয়ে। তেমনি মানুষ ও বহিঃপ্রকৃতি এবং মানুষ ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কও বদলায়। শিল্পে-সাহিত্যে সে-সম্পর্কের প্রতিফলন কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সমসাময়িক বিজ্ঞানের প্রগতির পর্যায়, শিল্পী-সাহিত্যিকের নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি, শিল্পী-সাহিত্যিকের দার্শনিক ও ধর্মমত।

সে-সব দিক বিবেচনা না করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কিছু ভস্মা আর র‍্যাস্ট ফার্নেসের জ্ঞান দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সেই বিচ্ছেদ ঘুচাতেই হবে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে, কোনো 'মেড-ইজি'-পড়া বিদ্যেয় এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না। সুখের বিষয়, সে-বিচ্ছেদ ঘুচাবার কাজে খুবই নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন অমোদের কোন কোন গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কোন কোন শিল্পীও যে-জীবন, যে-সংগ্রামের রূপ তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলছেন, সেই জীবনে, সেই সংগ্রামে তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। শ্রম ও শ্রমিক সম্পর্কে আমাদের এই নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীও নতুন। সেই পুরানো বন্দী ক্রীতদাস যন্ত্র-মানুষ আর নয়, সে মরেছে। এ এক নতুন জীবনদর্শন—সমাজ, বন্ধুবান্ধব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, শিশু, শিল্প এ সব কিছুর সম্পর্কে এ এক নতুন দৃষ্টি; আর শিল্প নিজেও সেই নতুন জীবন গড়বার সংগ্রামের সৈনিক। যুগোপযোগী নতুন সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করবেনই। তার প্রাথমিক ত্রুটি অসম্পূর্ণতার অসন্তোষই তাঁকে এগিয়ে দেবে ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আরও সুন্দর সৃষ্টির পথে। এ-দিকটাকে বাদ দিয়ে কেবল new tools of production-এর ওপর গড়ে-তোলা সাহিত্যিক new tools সম্ভবই নয়।

তাঁর প্রবন্ধে তাই new tools-এর রূপ প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই, খুবই অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র আছে। অথচ 'উপন্যাস' হিসেবে তাঁদের রচনা কতটা সার্থক হয়েছে সে আলোচনা করবেন না বলতে গিয়ে উপন্যাস শব্দটিকে ঊর্ধ্বকমায় ঘিরে যেন সন্দেহই প্রকাশ করলেন। ফলে, কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে এল না। তিনি আলোচনা করতে নারাজ; কেবল কতকগুলো সূত্র বলে দিয়েছেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও আমাদের যে-সব লেখক নানাভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে 'যান্ত্রিক' চাপ দিয়ে কোনো সুফল ফলবে না। সাহিতিকরা ফাঁকিবাজ, তাঁরা কিছু জানতে বুঝতে চান না—এই রকমের উগ্র প্রকাশ করলে ক্ষতিই হবে। ফাঁকিবাজ সাহিত্যিকও নিশ্চয়ই আছেন; তথাকথিত নতুন আবিষ্কার চটক লাগিয়ে তাঁরা মাঝে মাঝে আসর জমাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবাই ওই মহা-ফাঁকিমন্ত্র নিয়ে বেসাতি করেন না। শিল্পী সাহিত্যিকরা তো অতি-সামাজিক জীব নন—তাঁরাও এই সমাজেরই মানুষ। শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন যান্ত্রিকভাবে আসে না, এলে সাহিত্যের অনিষ্ট হয়; তেমনি অতি জটিল পথে হলেও মূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি শিল্প সাহিত্য ও শিল্পী-সাহিত্যিককে সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করে লেখক বলছেন "এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের মধ্যে সকলের অর্থনৈতিক কোন বিরোধ নেই"! এ কেবল "নিষ্ঠার অভাব, সবই "ফাঁকি"! সাহিত্যিকরা যদি ব্যাপকভাবে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে এই ফাঁকিবাজি চালাতে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁদের সামাজিক অস্তিত্বের বিন্যাসটাই সমগ্রভাবে সেই ফাঁকিবাজির আশ্রয়। অথচ উক্ত প্রবন্ধের লেখক বলেছেন, এ ফাঁকি "আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আভ্যন্তরীন বিরোধ" নয়। সাহিত্যিককে তাঁর সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমালোচক তাঁকে দেখছেন নিতান্ত আংশিক ও অসম্পূর্ণ এক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে।

"যাঁরা আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারা (যেমন সোশ্যালিজম-কম্যুনিজম) উপলব্ধি করেছেন" বিশেষ দৃঢ় সেই সব লেখক সম্পর্কে প্রবন্ধকার উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। আধুনিক tools of production সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের অভাব ধরে নিয়ে তিনি বিদ্রূপে

বিজ্ঞানের "কালোপযোগী" উপমা দিয়ে "শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁদের "নাকী কান্নাকে" "কারখানার ভোঁ"র সঙ্গেই তুলনা করেছেন!

আমাদের যে-সব লেখক সোশ্যালিজ্‌ম্ কম্যুনিজ্‌মের ভাবধারা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের রচনায় সেই উপলব্ধি যদি এতটুকুও ফুটে ওঠে থাকে, সে কিছু কম হয়নি। আর অনেকে নিশ্চয়ই এই পত্র লেখকের সঙ্গে একমত হবেন যে, আমাদের কয়েকজন গল্প-লেখক, উপন্যাসিক কবির রচনায়ও প্রগতির ছাপ বেশ স্পষ্টই দেখা গেছে; তাঁরা অন্তত পলায়নপর নিষ্ক্রিয়তা-ধর্মী রোম্যান্টিক সাহিত্যের প্রচার কম-বেশি কাটিয়ে উঠেছেন, আজও হয়ত তাঁদের রচনায় মানুষ ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের চিত্র তেমন রসোত্তীর্ণ হয়ে বলিষ্ঠ রূপে ফুটে ওঠেনি। আজও হয়ত সেই সংগ্রামের ভেরী দিয়ে ভবিষ্যতের পথে মানুষ ও সমাজের ঊর্ধ্বগতি তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। কিন্তু তাঁরা যে নিষ্ক্রিয় সমালোচনার স্তর পেরিয়ে সক্রিয় আশাবাদের পথে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্-এর ধারা অধিগত করবার পথেই অগ্রসর হয়েছেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রবন্ধকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি অতর্কিতে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন"! সবই মাপা: "অতর্কিতে"..."কয়েক পা"! নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ভাষায় এক কথায় রায় দেওয়া হয়েছে! কিন্তু তাঁর এই রায় মেনে নেবার স্বপক্ষে ত কোন যুক্তিই তিনি দেখাননি। আমরা ত দেখছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব ও প্রকাশ বেশ জোরালো হয়েই দেখা দিয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবেই তাঁরা উপযুক্ত টেকনিকও আয়ত্ত করছেন। কিন্তু ওই নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী ছাড়া এক নিরবলম্ব সকল বিষয়ের দাবী প্রশ্নটিকে বিপথে চালিত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলেই প্রতিপন্ন হবে—এ আশা করা যায়। এখনও আমাদের এই লেখকরা হয়ত প্রচারধর্মী ও মেলোড্রামাটিক হবার ভয়ে সংগ্রামশীল ও সংগ্রাম-মুখী মানুষের পরিপূর্ণ চেহারাটিকে নিঃসংকোচে অবলম্বন করে উঠতে পারছেন না, সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উপাদানের ওপর গাঢ় মনঃসংযোগের বহু উদাহরণ আমরা পেয়েছি। বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিখুঁত টেকনিকের জন্যে আরও বহু মাল-মশলা সংগ্রহ করবেন। মানুষের সংগ্রামে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে তার সুযোগও বেড়ে গেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিককে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করে তুলতে হবে শ্রমিক-জীবনের সার্থক পরিবেশটুকু সৃষ্টি করবার জন্যে রূপে-রসে ধ্বনিতে সঠিক পরিস্থিতিটি বাস্তব করে তুলতে হলে কলকারখানার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। মানুষ ও তার কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক ও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে সাহিত্যিককে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সমালোচনার ভেতর দিয়ে মানুষের ও সকলের ঊর্ধ্বগতি পথের নির্দেশটি তাঁদের রচনার চালনীশক্তি রূপে যত বেশি প্রাধান্য লাভ করবে ততই তাঁরা একরকম আপনার থেকেই এই সমস্ত বিষয়ে অধিকতর সচেতন ও সযত্ন হবার প্রয়োজন বোধ করবেন। কারণ তাঁরা, বিশেষ করে যাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারা "উপলব্ধি" করেছেন তাঁরা, আসলে "ফাঁকিবাজ" নন। ইতিমধ্যে সমালোচকের কাজ হবে উপযুক্ত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টির যথার্থ মূল্যবিচার করা।

বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার ১১৪ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে 'টাঙ্কি বাষ্ট ছয়া'-র স্থলে 'টাঙ্কি বাষ্ট ছয়া' হইবে।